ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

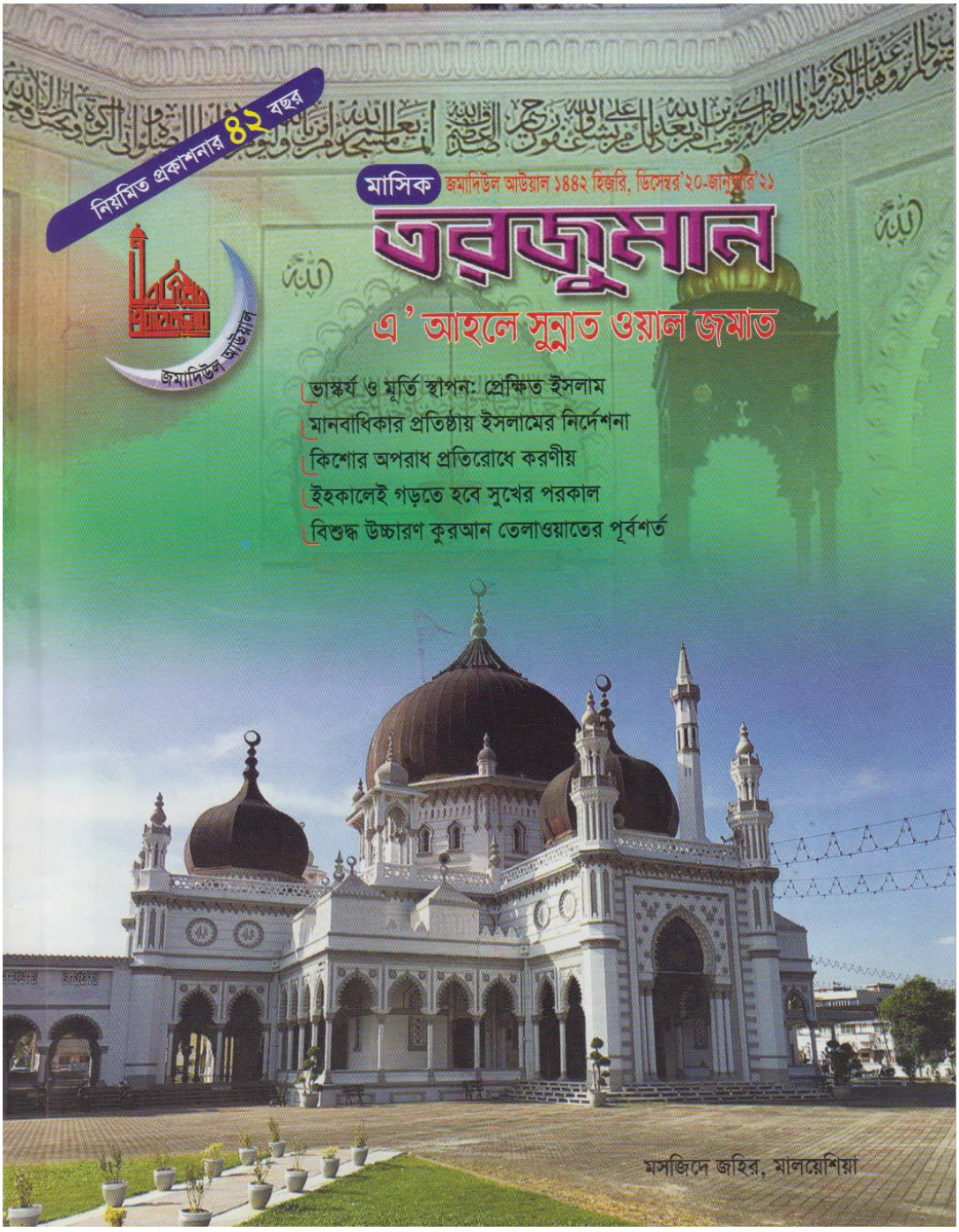

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

মাসিক
তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ৫ম সংখ্যা

জমাদিউল আউয়াল-১৪৪২ হিজরি
ডিসেম্বর-জানুয়ারি '২০-২১, পৌষ-মাঘ-১৪২৭

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫ চলতি হিসাব,
রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা, চট্টগ্রাম।

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ৯

শানে রিসালত ১০
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইহকালেই গড়তে হবে সুখের পরকাল ১২
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের নিদের্শনা ১৪
মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

বিশুদ্ধ উচ্চারণ কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বশর্ত ১৭
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মাসুম

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় ২৩
খন্দকার ফাজানা রহমান

সাধারণ জ্ঞান ২৫
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

করোনা প্রতিরোধে অজু ২৭
কুতুব উদ্দিন চৌধুরী

ইসলামের দৃষ্টিতে হতাশার কুফল ২৯
গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

ভাস্কর্য ও মূর্তি স্থাপন: প্রেক্ষিত ইসলাম ৩১
মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি

বিশ্ব মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক আমাদের প্রিয়নবী ৩৬
সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফী সাধকদের অবদান ৪৪
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

ছবি তোলা ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা ৫০
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

প্রশ্নোত্তর ৫৪

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৫৮

সম্পাদকীয়

১৪৪২ হিজরী বর্ষের ৫ম মাস জমাদিউল আউয়াল। এ মাসের ১৫ তারিখ ঐতিহাসিক উষ্ট্রযুদ্ধ সংঘটিত হয়, এ মাসের ৮ তারিখ মাওলা আলী শেরে খোদা হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জন্মগ্রহণ করেন। ১১৮ হিজরীর ১০ তারিখ বিশ্বখ্যাত সাধক হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কোবরা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও ১৬ হিজরীর এ মাসের ২৬ তারিখ বিশ্বখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওফাত লাভ করেন। এ সকল কারণে এ মাস অতীব মর্যাদাপূর্ণ মুসলিম বিশ্বে। মাওলা আলী শেরে খোদা হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রাদ্বি.) ইসলাম'র প্রচার-প্রসারে এক অন্যন্য ভূমিকা রেখেছিলেন, এজন্য তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। শরীয়ত তরীক্বতের প্রচার-প্রসারে ইসলাম'র সর্বজনীনতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও হযরত সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। গভীর শ্রদ্ধার সাথে মহান ওলীদের স্মরণ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দরজা বুলন্দ করুন।

মুসলিম বিশ্ব আজ ইহুদী-নাসারা মহামারীতে আক্রান্ত। এ মহামারী কোভিড-১৯ থেকেও মারাত্মক। কেননা এ মহা মারীতে আক্রান্ত হবার কারণে ঈমান হারানোর সাথে অন্তঃদলীয় কোন্দল ও আত্মহুতির আশংকায় চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে মুসলিম বিশ্ব। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল রাষ্ট্রকে আরব আমীরাত, বাহারায়েন স্বীকৃতি দিয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সউদী আরবে ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন এখন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ সফর করছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও সউদী আরবের প্রচন্ড চাপে পড়ে পাকিস্তান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। ইসরায়েল অধিকৃত গাজায় ১০ লক্ষাধিক ফিলিস্তীন মানবেতর জীবন-যাপন করছে। চীনের উইঘুয়ের ১৫ লক্ষাধিক মুসলিম সংশোধনাগারে বন্দী অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে। মায়ানমার থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে উদ্ভাস্ত হয়ে পড়ে, কাশ্মীরে মুসলমানদের জমি-জমা বেহাত হয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার মুসলমান নির্যাতিত হয়ে কারাবরণ করছে। জাতিসংঘে রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন-রাশিয়াসহ ১৩টি রাষ্ট্র মায়ানমারের পক্ষ নিয়েছে। প্রতিবেশি ভারত ভোটদানে বিরত রয়েছে কুটনৈতিক কারণে। এ ছাড়াও শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে, মানবাধিকার হারাচ্ছে। উপরন্তু, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন-সৌদি আরব অভ্যন্তরীন সহিংসতায় টালমাটাল অবস্থায়। এর প্রায় সবকটাই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের পরিবর্তে ইহুদী নাসারাদের আনুগত্যের দিকে ধাবমান হওয়ার মন-মানসিকতা। ও.আই.সি. (৫৬ রাষ্ট্র)'র পক্ষে কোন রকম কঠিন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা নেই। পরাস্ত সৈনিকের মতো আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ। শত্রুর সাহায্য নিয়ে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। ভাইকে মারার জন্য শত্রুর সঙ্গে আলিঙ্গন করছি। হে দুর্ভাগা জাতি! কখন হবে আমাদের সুবুদ্ধি। আল্লাহ্ আমাদের হেদায়েত করুন, ক্ষমা করুন, অপকর্ম থেকে পরিত্রাণ দিন।

১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম ১৯৭১ সালে এ দিবসে। যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোন সহ লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং আমাদের স্বাধীনতাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সুসংহত ও সফল করার জন্য আমাদের মাঝে দেশপ্রেমের চেতনা সর্বদা জাগরুক থাকুক এ প্রার্থনাই করি স্রষ্টার কাছে।

দরসে কোরআন

বিশুদ্ধ ঈমান ইবাদত গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি

হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (١٢) لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (١٣) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (١٤)

তরজমা ঃ (মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? যারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদের কে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে (দেশ থেকে) বের হয়ে যাবো এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মান্য করব না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাধঁলে আমরা অবশ্য তোমাদেরকে সাহায্য করব এবং মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। যদি তারা (অর্থাৎ কিতাবধারী কাফিরগণ) নির্বাসিত হয় তবে তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তাদের সাথে বের হবেনা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে, তবে তারা তাদের সাহয্য করবেনা। যদি তাদের সাহায্যও করতে আসে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্য পাবেনা। নিশ্চয় তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের (অর্থাৎ মুমিনগণের) ভয় অধিক রয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা বোধশক্তিহীন সম্প্রদায়। তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেনা। কিন্তু দুর্গ-ঘেরা জনপদসমূহে অথবা প্রাচীরের আড়ালে থেকে পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ ভীষণ। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন। কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এজন্য যে, তারা বিবেকহীন সম্প্রদায়।

[সূরা আল হাশর- ১১ থেকে ১৪ নং আয়াত]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

শানে নুযুল

উদ্ধৃত আয়াতের শানে নুযুল বর্ননায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় বসবাসরত মুনাফিকরা পার্শ্ববর্তী ইয়াহুদী গোত্র বনী নজীরের সাথে এ মর্মে গোপন অঙ্গীকার করেছিল যে-যদি তোমাদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয় তবে আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবো। আর যদি মুসলমানগণ বিজয়ী হয়ে তোমাদের কে নির্বাসিত করে দেয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে চলে যাব। মহান আল্লাহ তখনই আয়াত অবতীর্ণ করে মুনাফিকদের এ গোপন অঙ্গীকার ফাঁস করে দিলেন। [তাফসীরে নূরুল ইরফান]

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কোরআনে করিমের আয়াত ও হাদীছে নববী শরীফের রেওয়ায়তের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ও মুসলমানের সবচেয়ে ক্ষতিকর, ভয়ংকর ও নিকটতম ঘর-শত্রু হলো মুনাফিক সম্প্রদায়। এরা প্রকাশ্যে

টুপি-দাঁড়ি পাগড়ী ধারী নামাযি মুসলমান। আর অপ্রকাশ্যে নির্ভেজাল কাফির। তারা দিনের আলোতে আল্লাহর নবীর মজলিশে ছাহাবায়ে কেরামের সাথে অবস্থান করে, আর রাতের আঁধারে মদীনার ইয়াহুদীগণ ও মক্কায় কাফিরগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এসব মুনাফিকরা প্রকাশ্যে দ্বীনদার-নামাজি রূপ ধারণ করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা মোটেও মুমিন নয়। এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের প্রকৃত পরিচয় ও আসল স্বরূপ উন্মোচন করার লক্ষ্যে কুরআনে মজীদে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা আল-মুনাফিকুন নাযিল করেছেন। তাছাড়া কুরআনে করীমের বৃহত্তম সূরা আল বাক্বারার প্রারম্ভিক পর পর চার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ সর্বাবস্থায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কাফিরদের প্রসঙ্গে। অতঃপর আল্লাহ পর পর তের আয়াত নাযিল করেছেন মুনাফিকদের প্রকৃত স্বরূপ, চরিত্র ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে। মুফাসসেরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন-কাফির-মুশরিকদের পরে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে- মুনাফিকরা اخبث الخبائث অর্থাৎ সর্বনিকৃষ্ট, ঘৃন্য ও ধীকৃত শ্রেণি। (নাউজুবিল্লাহ) কুরআনে করীমে তাদের এহেন নিকৃষ্টতম অবস্থানকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে সূরা আন-নিছার ১৪৫ নং আয়াতে- ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار অর্থাৎ মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। (নাউজুবিল্লাহ)

হাদিছে নববী শরিফে এরশাদ হয়েছে

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر - متفق عليه

অর্থাৎ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-রাসূলে করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-চারটি বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ। যথাক্রমে (এক) কোন কিছু আমানত রাখা হলে আত্মসাৎ করে। (দুই) কথোপকথনে মিথ্যাচার করে (তিন) অঙ্গিকার করলে ভঙ্গ করে (চার) ঝগড়া বিবাদ হলে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে। মুনাফিকীর এ চার বৈশিষ্ট্য থেকে মহান আল্লাহ মুমিনদের কে হেফাজত করুন। আমীন।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীছ শরীফ যেন আলোচ্য ১১নং আয়াত এর তাফসির। উক্ত ১১নং আয়াতাখানার ভাষ্য হলো - মুনাফিকরা মদীনার ইয়াহুদীগোত্র বনু নজীর এর সাথে গোপনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল যে, মুসলমানরা তাদের কে বহিষ্কার করলে মদীনা শরীফ হতে মুনাফিকরাও তাদের সাথে বের হয়ে যাবে। আর যুদ্ধ হলে মুনাফিকরা ইয়াহুদীগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। আল্লাহ বলেন- মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। কেনন, ইয়াহুদীরা মদীনা শরীফ থেকে বহিস্কৃত হলেও মুনাফিকরা কখনো মদীনা ত্যাগ করে নাই। তাই হাদীছে নববী শরীফ এর ভাষ্যানুযায়ী মুনাফিকদের মিথ্যাচার ও ওয়াদা ভঙ্গ করার বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হল।

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

সূরা হাশর এর ১১নং আয়াতের উপরোক্ত অংশ বিশেষ এর মর্মানুযায়ী কাফিরগণই হলো মুনাফিকদের ভাই, মুসলমানরা নয়। (নাউজুবিল্লাহ) সুতরাং মুনাফিকরাও কাফির। বাহ্যিক বেশ-ভূষায় মুসলমানের অভিনয় করলেও কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী তারা আক্বিদা-বিশ্বাসে কাফির। তাই মুনাফিক-কাফির পরস্পর ভাই-ভাই।

অন্য আয়াতের ঘোষণা হলো- انما المومنون اخوة অর্থাৎ মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভই। সুতরাং ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ হলো ঈমান-আক্বিদা। আমল-ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ভিত্তি হলো ঈমান-আক্বিদা। এ জন্য কুরআনে করীমের সর্বত্র মহান আল্লাহ আমল এর পূর্বে ঈমান কে উল্লেখ করেছেন।

الا الذين امنوا و عملوا ان الذين امنوا و عملوا الصالحات

এর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়-ঈমান-আক্বিদা শুদ্ধ ও সৃদৃঢ় হওয়া ব্যতিরেকে আমল-ইবাদত-রেয়াজত এর কোনরূপ গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর দরবারে হবে না। মহান আল্লাহ সকল কে উপরোক্ত দরছে কোরআনের উপর আমল করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে
মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللهُ وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَنِىْ فَقَدَ اَبْغَضَ اللهُ

[اَلْمُسْتَدْرَكَ اَلْمُعْجَمُ الْكَبِيْرِ]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا [رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ]

অনুবাদ: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)কে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো, যে আমাকে ভালোবাসলো সে আল্লাহকে ভালোবাসলো। যে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষ করলো সে আমার প্রতি বিদ্বেষ করলো, যে আমার প্রতি বিদ্বেষ করলো সে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ করলো।

[মুস্তাদরাক খন্ড-৩. পৃ. ১৩০, আল মুজামুল কবীর, হাদীস-৬১৭৪]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘর, আর আলী সে গৃহের দরজা। [তিরমিযী খন্ড-৫.পৃ.৬৩৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত দু'টি হাদীস শরীফ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মর্যাদা, নবীজির নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতো উচ্চাঙ্গের তা প্রতিভাত হয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কুরআন সুন্নাহর আলোকে তাঁর মর্যাদা আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কার কুরাইশ বংশে নবীজির নবুওয়ত ঘোষণার দশ বছর পূর্বে ৬০০ খৃস্টাব্দে অন্য বর্ণনা মতে নবুওত ঘোষণার ৭-৮ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

[তারিখুল খোলাফা, পৃ. ১১২]

তাঁর নাম আলী, পিতার নাম আবু তালিব, উপাধি আসাদুল্লাহ্ হায়দার, মুরতাদ্বা, উপনাম, আবুল হাসান ও আবু তুরাব। তিনি আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। তাঁর মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ তিনি হাশেমী গোত্রের প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা। [তারিখুল খোলাফা, পৃ. ১১৩]

ইসলাম গ্রহণ: আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনা মতে- হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৮-১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

[তানযিহুল মাকানাতিল হায়দরীয়া কৃত. ইমাম আহ্মদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, কিশোরদের মধ্যে হযরত মওলা আলী (রা.) সর্বপ্রথম, ক্রীতদাসদের মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। [তারিখুল খোলাফা, পৃ. ১১৪]

পবিত্র কুরআনে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আহলে বায়তের অন্যতম সদস্য, যাঁদের পবিত্রতা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝ (٣٣)

অর্থ: হে আমার আহলে বায়ত, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চান। [সূরা আহযাব: আয়াত-৩৩]

মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্রতা তথা আহলে বায়তের মর্যাদা প্রসঙ্গে হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন-

فِىْ بَيْتِىْ اُنْزِلَتْ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا قَالَتْ فَارْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى فَاطِمَةُ وَعَلِىٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاَءِ اهْلِ بَيْتِىْ

[رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ]

অর্থ: আমার ঘরে আয়াত নাযিল হয়েছিল, 'হে আহলে বায়ত নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কেবল ইচ্ছা করেন, যে তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুতঃপবিত্র করতে। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন, আর বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমাদের আহলে বায়ত।

[বায়হাক্বী-আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৯৭৫]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শির্ক থেকে পুতঃপবিত্র ছিলেন

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করেছিলেন, তিনি নবীজির আদর্শ চরিত্র ও গুণাবলীর ধারক ছিলেন। এ কারণে মূর্তির অপবিত্রতা, শির্কের কদর্যতা থেকে তাঁর সত্ত্বা সর্বদা পুতঃপবিত্র ছিলো, তিনি কখনো মূর্তির পূজা অর্চনা করেননি, এ কারণে তাঁর উপাধি কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু।

[তানযিহুল মাকানাতিল হায়দরিয়া, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাতার প্রতি নবীজির সম্মান

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাতা হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের লালন পালনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিলো। তিনি নবীজিকে নিজ সন্তানের উপর প্রাধান্য দিতেন।

আপন মায়ের মতো নবীজির যত্ন নিতেন। নবীজি এরশাদ করেছেন, আমার আম্মাজান হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ আমার মা-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন। [মুস্তাদরাক, পৃ. ৫১]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাতা মদীনা মনোওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর তৈরি করার পর নবীজি তাঁর কবরে অবতরণ করে কবরকে বরকতমন্ডিত করেন।

[সিয়রু আলামিন নুবালা, খন্ড-২, পৃ. ৮৭]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে নবীজির বংশধারা

হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর বংশধর তাঁদের আওলাদ থেকে জারি করেন। আর আমার বংশধারা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বংশধারা থেকে জারী হবে। [আল মুজামুল কবীর লিততাবরানী, খন্ড-৩, পৃ. ১৪৪]

বর্তমান বিশ্বে যত আওলাদে রসূল বিদ্যমান তাঁরা আওলাদে আলী তথা হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র বংশধারার সাথে সম্পৃক্ত।

[আনোয়ারুল বায়ান, খন্ড-১ম, পৃ. ৮২]

শাদী মুবারক

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একাধারে নবীজির চাচাতো ভাই এবং মামাতো, হিজরি দ্বিতীয় সনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তমা কন্যা, খাতুনে জান্নাত বেহেশতের রমনীদের সর্দার হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সাথে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাদী মুবারক সম্পন্ন হয়। বেহেশতী যুবকদের সর্দার হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নূরানী সন্তান। মুহসিন নামে একজন যিনি বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন। জয়নব ও উম্মে কুলসুম নামে দু'জন কন্যা সন্তান তাঁদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার

তিনি ছিলেন একাধারে বড় মাপের মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ। হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَاتِ الْبَابَ

অর্থ: আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে ইচ্ছুক সে যেন এ দরজায় আসে।

[আল মুস্তাদরিক লিল হাকীম, খন্ড-৩, পৃ. ১২৬]

তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে ৫৮৬ টি হাদীস বর্ণনা করেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُوْلُ سَلُوْنِىْ اِلاَّ عَلِيًّا

অর্থ: রসূলুল্লাহর সাহাবাদের মধ্যে হযরত আলী ব্যতীত এমন কেউ নেই যিনি বলতে পারেন আমার কাছে তোমরা প্রশ্ন করো। [কানযুল উম্মাল, পৃ. ৩৯৭]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে আমি জানি। কোন আয়াত কি প্রসঙ্গে কোথায় নাযিল হয়েছে, প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে এটাও জানি যে, আয়াতটি কি রাত্রি নাযিল হয়েছে না দিনে।

আমি যদি সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখতাম তাফসীরের কিতাব ৭০টি উটের বোঝাই হতো। [তারিখুল খোলাফা, পৃ. ১৮৪]

হযরত ইসমাইল হক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান কুরআনে রয়েছে, কুরআনের সমগ্র ইলম সূরা ফাতিহায় রয়েছে, সূরা ফাতিহার সমস্ত জ্ঞান বিসমিল্লাহর মধ্যে রয়েছে, বিসমিল্লাহর সমস্ত ইলম 'বা' বর্ণের মধ্যে রয়েছে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, اَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ আমি বা-বর্ণের নীচের নুকতা হই। [রুহুল বয়ান, খন্ড-১ম, পৃ. ৬০৩]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ভালবাসা মুমীনের পরিচায়ক, প্রত্যেক সাহাবা সত্যের মাপকাঠি। তাঁরা সমালোচনার ঊর্ধ্বে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মুমীনের পরিচায়ক। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি গালমন্দ করা, অশালীন মন্তব্য করা, তাঁদের মর্যাদার অবমাননা করা, মুনাফিকীর পরিচায়ক।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلاَ يَبْغُضُه مُؤْمِنٌ

উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মুনাফিক ব্যক্তি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ভালবাসবেনা, কোনো মুমীন ব্যক্তি তাঁকে বিদ্বেষ করতে পারে না। [মুসনাদে আহমদ]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন-

اِنَّ عَلِيًّا مِنِّى وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِىّ كُلُّ مُؤْمِنٍ

অর্থঃ নিশ্চয় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার থেকে আর আমি আলী থেকে। তিনি প্রত্যেক মু'মীনের বন্ধু।

[তিরমিযী শরীফ, হাদীস-৫৭০৯]

লেখক : অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আশারা মুবাশরারা'র অন্যতম

ঈমানের সাথে নবীজির নূরানী সাক্ষাতে ধন্য সকল সাহাবী জান্নাতী, খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিশেষ দশজন সাহাবীদের অন্যতম। এরশাদ হয়েছে-

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة و عثمان فى الجنة و على فى الجنة و طلحة فى الجنة والزبير فى الجنة و عبد الرحمن بن عوف فى الجنة وسعد فى الجنة وسعيد فى الجنة وابوعبيدة بن الجرّاح فى الجنة (رواه الترمزى)

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জান্নাতী। [তিরমিযী শরীফ]

খিলাফত

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চার বছর আট মাস নয়দিন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হিজরি ৩৫ সনে ১০ যিলহজ্ব তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা মনোনীত হন। এ মহান সাহাবী হিজরি ৪০ সনে ২১ রমজান ইরাকের কুফা নগরীতে আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম নামক আততায়ীর তরবারীর আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন।

হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। এক বর্ণনা মতে নাজফে আশরফে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর হায়াতে মুবারাকা ছিল ৬৩ বছর। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতীর বর্ণনা মতে কুফার জামে মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। [তারিখুল খোলাফা]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওয়াসীলায় আমাদের অন্তরে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তথা আহলে বায়তে রসূলের ভালোবাসা নসীব করুন। আমিন।

ফাযিল, মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

জমাদিউল আউয়াল

হিজরী বর্ষের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে পঞ্চম মাস জমাদিউল আউয়াল আমাদের দ্বারে উপনীত। যারা আল্লাহ ও তদীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় জীবন ও সময় অতিক্রান্ত করেছেন, তাদের জন্যতো অতীতটা পূর্ণ গৌরব ও আনন্দের। যাঁরা ভবিষ্যতের পথকে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কোরবানী দানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁদের জন্যতো আল্লাহ স্বয়ং ভীতি ও সকল প্রকার দুশ্চিন্তা অপসারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু যারা এর বিপরীত তাদের কি হবে। যারা জীবন চলার পথে নাফরমানী ও অন্যায়কে অবলম্বন করে নিয়েছে কবে তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে? ক্বোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে বিবৃত ভয়ানক আযাব ও শাস্তির কথায় কি তাদের অন্তরে এতটুকু কম্পন সৃষ্টি হয়না? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা যা বলেছি, শুনেছি এবং বিশ্বাস করেছি আমলের ক্ষেত্রে আমরা অনিহার ঘোরে পাক খাচ্ছি। কি কারণে যেন আমরা বার বার পিছিয়ে যাচ্ছি আদর্শ, মুক্তি ও কল্যাণের পথ হতে। তাগুতি শক্তির অন্ধকারাচ্ছন্ন মোহনীয় ফাঁদে ধরা দিচ্ছি সকলে। প্রবৃত্তির দাসত্ব, শয়তানের ছলনায় তাই মার খাচ্ছি আমরা সবক্ষেত্রে। আজ জাতিগত ভাবে মুসলমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুঠোয়, ধর্মীয়ভাবে অন্যের ক্রীড়নক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসহায় ও পঙ্গু। এ লজ্জা হতে নিষ্কৃতির প্রচেষ্টা গ্রহণের আন্তরিক তাগিদ কি আমাদের মাঝে জাগ্রত হবেনা? অতএব আসুন আল্লাহর দরবারে আমাদের অতীতের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই এবং ভবিষ্যতের জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে সংকল্পবদ্ধ হয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সকল সীমাবদ্ধতা দুর করে দেন।

এ মাসের নফল এবাদত : এ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীগণকে নিয়ে বাদ মাগরীব বিশ রাকাত নফল নামায আদায় করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। দশবারে দুই রাকাত বিশিষ্ট বিশ রাকাত নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম। নামায শেষ করে ১০০বার নিম্ন বর্ণিত দরূদ শরীফ পাঠ করবেন- *আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।*

অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। এছাড়া এ মাসে অধিক হারে তেলাওয়াতে কোরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য সুন্নাত ও নফল এবাদতের মাধ্যমে খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করবেন। বিশেষ করে এ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা পালনের চেষ্টা কর বেন।

এ মাসের স্মরণযোগ্য দিন : এ মাসের ১৫ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক উহুদযুদ্ধ। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এ মাসের ৮ তারিখে। এ মাসে ওফাত লাভ করেন ১১৮ হিজরীর ১০ম তারিখ বিখ্যাত সাধক হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ১৬২ হিজরীর এমাসের ২৬ তারিখে হযরত সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওফাত লাভ করেছিলেন। হে আল্লাহ! আমাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য সম্মৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য এ মাসের প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজে লাগানোর তাওফীক দিন, আ-মী-ন।

আগামী চাঁদ মাহে জমাদিউস্ সানী

এ মাসের নফল এবাদত : প্রথম তারিখ প্রথম সন্ধ্যায় ১২ রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ নামায আদায় করতেন। এ নামাযের দ্বারা পরম সৌভাগ্য ও পুণ্য অর্জন করার আশা করা যায়।

নামাযের নিয়ম : প্রত্যেক বার দুই রাকাত বিশিষ্ট নিয়ত করবে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার আয়াতুল কুরসী ও এগার বার সূরা এখলাস পাঠ করবেন। চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সন্ধ্যায় দুই রাকাত করে বার রাকাত নামায আদায় করা যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে পনের বার সূরা এখলাস পড়বেন। নামায আদায়কারীর সকল সগীরা গুনাহ মাফ করা হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হবে বলে বর্ণিত।

মাসের ২০ তারিখের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলো নফল রোযা রেখে রাতে বিশ রাকাত করে নফল নামায আদায় করা সাহাবা কেরামের আমলের অন্তর্ভুক্ত। নামাযের পর ১০০বার দরূদ শরীফ পড়ে মুনাজাত করবেন।

এ মাসের প্রত্যেক দিন ফজর ও মাগরীব নামাযের পর ১০০বার নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পড়লে পারিবারিক জীবনের সকল অশান্তি হতে খোদার রহমতে শান্তি অর্জিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া হুওয়াল গানিয়্যুল মাতীন।

হে আল্লাহ তোমার হাবীবের ওসীলায় আমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ দান কর এবং উভয় জগতের সাফল্য নসীব কর। আ-মী-ন॥

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম-এর সান্নিধ্যই যথেষ্ট

সুলতান-ই হাসীনাঁ, সরতাজে মাহজবীনাঁ (সুন্দরদের বাদশাহ্, চাঁদ-কপাল লোকদের সরদার) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে যাঁরা ছিলেন, তাঁর সান্নিধ্যে রয়ে যাঁরা বরকত হাসিল করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁতে যেই তৃপ্তি বরকত পেয়েছেন, অন্য কারো সূরত বা চেহারা দেখে কিংবা অন্য কারো সঙ্গ অবলম্বন করে অনুরূপ তৃপ্তি ও বরকত পেয়ে ধন্য হতেন না। সরকার-ই দু' আলম-এর দিদার ও সুহবত (সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য)-ই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিলো। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন-

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا

অর্থাৎ যাঁরা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কদমযুগলে থাকেন, আপনার পবিত্র দরবরে অবস্থান করেন, তাঁরা অন্য কারো চেহারা-সূরত দেখাও পছন্দ করেন না। আপনার পা মুবারকের তালুও এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় যে, তা দেখার পর অন্য কোন সুন্দর ও সুশ্রী মানুষের চেহারার প্রতি দেখারও তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করবেন না।

অন্য এক কবিও একই কথা বলেছেন-

تخت سکندر پر وہ تھوکتے نہیں ہیں
بستر جن کا لگاھوا ھے تیرے درکے سامنے

অর্থ: ইয়া রসূলাল্লাহ্! যাদের বিছানা আপনার দরজা শরীফের চৌকাঠের সাথে লেগেছে, তারা তো ইস্‌কান্দর বাদশার সিংহাসনে থুথু ফেলার জন্যও যাবে না।

এমনটি হবেও না কেন? পবিত্র ক্বোরআন মজীদে খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্দর গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করে এরশাদ করেছেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ- وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ-

তরজমা: অতঃপর কেমনই আল্লাহর কিছু দয়া রয়েছে যে, হে মাহবূব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো।

[সূরা আ-ল-ই ইমরান: আয়াত-১৫৯: কানযুল ঈমান]

কুতুব-ই সিয়ার বা জীবনী গ্রন্থগুলোতে এমন অগণিত হৃদয়স্পর্শী ঘটনাবলী এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী চেহারা যে একবার দেখেছে অথবা তাঁর পবিত্র দরবারে কিছুক্ষণের জন্য বসেছে, তার অন্তরে সবসময় এ আরজু বদ্ধমূল হয়ে যেতো যেন তাঁর পবিত্র দরবারে সবসময় হাযির থাকার সুযোগ হয়ে যায়। আর যাঁরা হুযূর-ই আক্‌রামের উন্নততম চরিত্রের ছোঁয়া পেয়েছেন, তাঁরা শত কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হলেও তাঁদের নিজ নিজ পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা পর্যন্ত তাঁদের স্মৃতিপট থেকে হারিয়ে যেতো, বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিকতার কথাও তাঁরা ভুলে যেতেন। তখন তাঁরা অন্য কোন রাজা-বাদশার দিকেও আকৃষ্ট হতেন না। নিম্নে এমন একটি ঘটনা নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

সাইয়্যেদুনা হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ্ (হারিসার পুত্র যায়দ) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জাহেলিয়াতের যুগে নিজ মায়ের সাথে নানার বাড়ি যাচ্ছিলেন। বনী ক্বায়সের লোকেরা ওই কাফেলার উপর হামলা করে মালামাল ইত্যাদি লুঠ করে নিয়েছিলো। ওই কাফেলায় হযরত যায়দও ছিলেন। তাঁকে ধরে নিয়ে লুঠেরাগণ মক্কার বাজারে বিক্রি করে ফেললো। হাকীম ইবনে হেযাম তাঁর ফুফী হযরত খাদীজার জন্য তাঁকে খরিদ করলেন।

যখন হুযূর-ই আক্‌রামের বিবাহ্ হযরত খাদীজার সাথে হয়েছিলো, তখন তিনি হযরত যায়দকে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন।

ওদিকে যায়দের পিতার মনে সন্তান হারানোর বেদনা সবসময় পীড়া দিচ্ছিলো; এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

সন্তান-সন্ততির স্নেহ-মমতাতো এক স্বভাবজাত বিষয়। তিনি যায়দের বিচ্ছেদে কাঁদতেন আর দুঃখভরা কবিতা পড়ে বেড়াতেন। ঘটনাচক্রে তাঁর গোত্রের কয়েকজন লোকের হজ্জে যাবার সুযোগ হলো। তারা সেখানে হযরত যায়দকে দেখে চিনে ফেললো। তারা তাঁকে তাঁর পিতার অবস্থা শুনালো। তাঁর পিতা তাঁর বিচ্ছেদে যে সব বেদনাভরা কবিতা পড়তেন তা থেকে কয়েকটা পংক্তিও শুনালো। হযরত যায়দও তিনটি পংক্তি লিখে তাদের মাধ্যমে পিতা-মাতার নিকট পাঠালেন। পংক্তি তিনটির বিষয় বস্তু ছিলো, "আমি এখানে, মক্কায় আছি। আমি ভাল আছি। আমার জন্য আপনারা দুঃখ ও চিন্তা করবেন না। খুব বড় দয়ালু মুনিবের গোলামীতে আছি।"

তারা গিয়ে হযরত যায়দের কুশলাদি তাঁর পিতাকে জানালো এবং ওই কবিতার পংক্তিগুলো পড়ে শুনালো, যা যায়দ লিখে জানিয়েছিলেন। আর ঠিকানাও জানালো। হযরত যায়দের পিতা ও চাচা মুক্তিপণের টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে তাঁকে গোলামী থেকে আযাদ করার জন্য মক্কা মুকাররমায় এসে পৌঁছলেন। খোঁজ-খবর নিলেন। ঠিকানা জানলেন। শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এসে পৌঁছলেন। আর আরয করলেন, "হে হাশেমের বংশধর, আপন সম্প্রদায়ের সরদার, আপনার হেরম শরীফের অধিবাসী, আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী, আপনারা নিজেরা কয়েদীদেরকে মুক্ত করেন; ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ান, আমরা আমাদের পুত্রের সন্ধান করতে করতে আপনার নিকট এসে পৌঁছেছি। আমাদের উপর ইহসান করুন! দয়া করুন। আর ফিদিয়া (মুক্তিপণ) টুকু গ্রহণ করুন এবং তাকে মুক্ত করে দিন। এমনকি নিয়ম মাফিক যা ফিদিয়া (মুক্তিপণ) আসে তা থেকে বেশী নিন। তবুও তাকে মুক্ত করে দিন।"

হুযুর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ফিদিয়ার কথা মুখ্য নয়, যায়দকে ডাকো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও! সে যদি তোমাদের সাথে যেতে চায়, তবে কোন ফিদিয়া বা মুক্তিপণ ছাড়াই সে তোমাদের। আর যদি যেতে না চায়, তবে আমি এমন লোকের উপর জবরদস্তি করতে পারিনা, যে নিজে যেতে চায়না।" তারা বললো, "আপনি আমাদের উপর আশাতীত ইহসান করেছেন। আপনার এ প্রস্তাব আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম।"

হযরত যায়দকে ডাকা হলো। হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি কি তাদেরকে চিনো?" তিনি আরয করলেন, "জী-হাঁ, আমি তাঁদেরকে চিনি। ইনি আমার পিতা, ইনি আমার চাচা।" হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ ফরমালেন, "আমার অবস্থাও তোমার জানা আছে। এখন তোমার ইচ্ছা। আমার নিকট থাকতে চাইলে আমার নিকট থাকো! আর যদি তাদের সাথে যেতে চাও, তবে আমি অনুমতি দিলাম।" হযরত যায়দ আরয করলেন, "হুযূর! আমি আপনার মোকাবেলায় (পরিবর্তে) অন্য কাউকে কিভাবে পছন্দ করতে পারি? আপনি আমার জন্য পিতার স্থানেও, আমার চাচার স্থানেও।"

এটা শুনে তাঁর পিতা ও চাচা বললেন, "হে যায়দ! তুমি কি গোলামী করাকে আযাদীর উপর প্রাধান্য দিচ্ছো? পিতা, চাচা ও পরিবারের সবার মোকাবেলায় গোলাম হিসেবে থাকাকে পছন্দ করছো?" হযরত যায়দ বললেন, "হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে (হুযূর -ই আক্‌রামের দিকে ইঙ্গিত করে) এমন কিছু (স্নেহ ও মায়া মমতা ইত্যাদি) দেখেছি, যার মোকাবেলায় অন্য কিছুকেই পছন্দ করতে পারি না।"

হুযূর-ই আক্‌রাম যখন যায়দের মুখে এ জবাব শুনলেন, তখন তাঁকে কোলে নিয়ে নিলেন আর এরশাদ ফরমালেন, "আমি তাকে আমার পুত্র করে নিলাম।"

যায়দের পিতা ও পিতৃব্য এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন। আর খুশী মনে তাঁকে রেখে চলে গেলেন। হযরত যায়দ তখন অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। শৈশবের এ অবস্থায় নিজের পিতা-মাতা, পরিবারের সদস্যগণ ও আত্মীয়-স্বজনকে রাহমাতুল্লিল আলামিনের গোলামীর উপর ক্বোরবান করে দেওয়া কোন মা'মুলী কথা নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকেও হযরত যায়দ ইবনে হারিসার মতো আল্লাহর হাবীব, আমাদের আক্বা ও মাওলার জন্য উৎসর্গ হবার তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

লেখক: মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

ইহকালেই গড়তে হবে সুখের পরকাল

মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতির মালিক, যিনি নিজ দয়ায় আমাদেরকে তাঁর প্রশংসা করার ভাষা ও অবকাশ দিয়েছেন। তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি পবিত্র বান্দাদের ভালবাসেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপাসনায় কারো অংশীদারিত্ব নেই। আমাদের কা-ারী ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দা ও তাঁর শ্রেষ্ঠতম রাসূল।

আমরা একথা সবাই জানি যে, আমাদের মৃত্যুর বিষয়টি যতটা নিশ্চিত, জীবনের স্থিতি ও আয়ু নির্ধারণ ততটাই অনিশ্চিত। আর পরকালে বিচার পূর্বক পুরস্কার বা শাস্তি ইহকালের বিশ্বাস ও কর্মভিত্তিক। ইহজীবন আমাদের কর্ম সম্পাদনের। অর্থাৎ এ জীবন ভাল বা মন্দ আমল অর্জন করার অবকাশ। আর পরকাল তার সুফল বা কুফল ভোগ করার অনন্ত সময়। তা আর শেষ হবে না। আল্লাহ্ কত দয়ালু যে অর্জনের জন্য ইহকাল তিনি স্থির করে দিয়েছেন। আমলের জীবনকাল সীমিত, আর প্রতিদান ভোগের জীবনটা অনন্তকালব্যাপী। তাই আমাদের দেখা উচিত, সীমিত এ ইহজীবনে আমরা অনন্ত আগামী জীবনের জন্য কী অগ্রায়ন করছি। কারণ, বান্দা তার জীবনের খুঁটিনাটি আমল'র কথা ভুলেও যাবে, আবার কৃত অপরাধ অস্বীকারও করবে। তার অস্বীকার প্রবণতার কারণে তার হাতে দেওয়া হবে আমলনামা। যেখানে লিপিবদ্ধ থাকবে তার সমস্ত কৃতকর্মের নথি।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনুল হাকীমের সুরা হাশর'র ১৮তম আয়াতে ইরশাদ করছেন, 'হে আমার ওই সকল বান্দা, যাঁরা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কী আমল অগ্রে প্রেরণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিঃসন্দেহে, তোমরা যা (আমল, বড় কি ছোট, পুণ্য, কি পাপ) করে থাক, তা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ অবহিত'। আয়াতে কারীমার আলোকে নির্ধারিত, তাতে পরকালীন পাথেয় চিন্তার নির্দেশনাই সুস্পষ্ট।

আয়াতে সম্বোধিত হলেন নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকল ঈমানদার ব্যক্তি। এ আয়াতে একটি নির্দেশনা দু'বার ঘোষিত। আয়াতের প্রারম্ভেও, আবার তার শেষভাগেও। তা হলো, 'আল্লাহ্কে ভয় করো'। প্রতিটি মুমিন বান্দাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রাখেন যে, 'আল্লাহ্ অন্তর্যামী'। মনের গতি প্রকৃতি তিনি সম্পূর্ণ জানেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। তাই উক্ত নির্দেশনায় ধর্মের সমস্ত অনুশাসনই সক্রিয়। মাঝখানে রয়েছে, আগামীকাল'র জন্য কী সম্বল সঞ্চয় করা হচ্ছে, তা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখা। আমল পেশ করা বা সঞ্চিত করার আগেই আল্লাহর ভয় মনে জাগরুক রাখা অতি প্রয়োজন। যাতে আমল 'ইখলাস' বা নিষ্ঠার সাথে অর্জিত হয়। দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য মনে রেখে সম্পন্ন হলে তা যতই ভাল কাজ হোক, পারলৌকিক কল্যাণে এগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই, প্রারম্ভেই আল্লাহর ভয় অন্তরে না এলে নিষ্ঠা অর্জিত হবে না। 'আল্লাহর ভয়'– এর অপর নাম তাকওয়া। এটা না থাকলে পবিত্র কুরআনও তাকে পথ দেখাবে না। কেননা কুরআনের প্রধান পরিচিতি, 'হুদান লিল মুত্তাকীন'। অপর আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ, 'তোমরা পথের সম্বল যোগাড় করো, অতঃপর সর্বোত্তম পাথেয় হল 'তাকওয়া'। এটার ভিত্তিতে 'আগামীর সম্বল' আহরণ করা হলে, তা বিনষ্ট হবে না। দ্বিতীয়বার এ বাক্যের পুনরুক্তির কারণ, তোমাদের আমল যেন কৃত্রিম ও পরকালে প্রত্যাখ্যাত না হয়ে যায়। জেনে শুনে আল্লাহ্কে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় ঈমানও বরবাদ। তাই, মনে রাখা জরুরি যে, বান্দা কে কী আমল করছে, সবকিছু আল্লাহ্ খবর রাখেন। এরূপ তিনি অনেক জায়গায় সতর্ক বার্তার পুনরুল্লেখ করেছেন। যেমন, 'ওয়ামাল্লাহু বিগা–ফিলিন আম্মা তা'মালূন। 'অর্থাৎ' তোমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা গাফিল নন'।

আমাদের একথাও স্মর্তব্য যে, ইহকালে আমাদের কৃতকর্মসমূহ পরকালের প্রতিদান প্রত্যাশায়। আয়াতে বলা হয়েছে, 'লিগাদিন'–অর্থাৎ 'আগামীকাল' এর জন্য। এখানে পরকালকেই আগামীকাল বলা হয়েছে। এরমধ্যেও রয়েছে বিবিধ তাৎপর্য। পরকাল'র বিপরীতে পার্থিব জীবনের চলমান সময়কে আমরা বলি 'ইহকাল'। তাই,

পরকাল যদি 'আগামীকাল' শব্দে ব্যক্ত হয়, তবে এর বিপরীতে ইহকাল হয় আজ। আমরা যেদিন ইহজীবন শেষ করে চোখ বুঁজবো, তখনই শুরু হবে আগামীকাল বা পরকাল। যেহেতু, আমাদের এ জীবন নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই শেষ, কাজেই তা আগামীকাল'র চেয়ে নিকটতর। মুফাসসিরগণ, এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা– এক. সমগ্র ইহকাল পরকালের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প, যা একদিনেরও সমান নয়। অর্থাৎ আমাদের নিজ নিজ জীবনকালের হিসাবে হলেও কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের তুলনায় অতি অল্প। আর এ নশ্বর পৃথিবীর বয়স হিসাবেও মহাকাল বা হিসাবোত্তর অনন্তকালের তুলনায় এটি খুবই স্বল্প। দুই. পার্থিব জীবনের তুলনায় এ আখেরাত সুনিশ্চিত। আজকের দিন শেষ হলেই আগামীকাল যেরূপ সুনিশ্চিত, তেমনি ইহকাল শেষে পরকালের আগমন–এটাও নিশ্চিত, অমোঘ সত্য, অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী। তিন. এটা অতি নিকটবর্তী। বর্তমান'র সাথে এ নৈকট্য বুঝাতে একে 'আগামীকাল' বলা হয়েছে।

কিয়ামতের নিকটবর্তিতাকে আল্লাহ্ তাআলা খুবই গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। সুরা ক্বামার এ বিষয় দিয়েই শুরু হয়েছে যে, 'ইক্বতারাবাতিস সা–আতু' অর্থাৎ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় নিকটস্থ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ দু' আঙ্গুল মুবারক একত্র করে দেখিয়ে বলেছেন, 'আমি ও ক্বিয়ামত এ রকমই'। অর্থাৎ তিনি শেষ নবী, এটা শেষ যমানা। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। নবীজির আগমনকাল হতে সৃষ্টিকুল এ কিয়ামতের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্বিয়ামত বা মহাপ্রলয়, যা কমবেশি প্রায় মানুষের কাছে অজানা, তা কুরআন–সুন্নাহতে বর্ণিত সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার ক্বিয়ামত। এটাতে সবাই নিশ্চুপ থাকে, অধিকাংশই এর সত্যতাকেও স্বীকার করে। কিছু আছে, যারা এটা নিয়েও উপহাস করে। এ অবিশ্বাসী, উদ্ধত লোকেরা প্রশ্নাসু দৃষ্টিও তোলে। যাদের কথা পাক কুরআনে মহান আল্লাহ্ তালা উদ্ধৃত করেছেন,' বরং মানুষ তার অনাগত কাল নিয়েও ধৃষ্টতা দেখাতে চায়, সে প্রশ্ন করে, কখন আসবে সে ক্বিয়ামতের দিন?' সাথে সাথেই আল্লাহ্র বাণীতে উত্তরও আসে, 'যখন দৃষ্টির বিভ্রম ঘটবে (হঠাৎ দৃষ্টি চমকিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে) ও চাঁদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, 'কোথায় পালানোর জায়গা'? এ কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুরা হাজ'র শুরুতে লক্ষ্য করা যাক এর ভীতিকর অবস্থার একটু বর্ণনা, 'হে মানবজাতি, তোমরা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের ভূকম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার! সেদিন তোমরা তা দেখবে, প্রত্যেক দুগ্ধদানকারিণী বিস্মৃত হবে তার দুধের শিশুটির কথাও, আর প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা (তাৎক্ষণিক) গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখবে মাতলামি অবস্থায়, অথচ তারা নেশাও করেনি। বস্তুত আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন'।

আরেকটি ক্বিয়ামত আপেক্ষিক। এটা একান্ত নিজের জন্য, যা অন্যে অনুভব করতে পারবে না। যেমন মৃত্যুর কষ্ট। এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিয়ামত। হাদীস শরীফে আছে, যে মৃত্যুবরণ করে, তার কিয়ামত (নিজের কাছে) সংঘটিত হয়ে যায়। মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থান কবর অর্থাৎ বরযখ। যা আখেরাতের প্রথম সোপান। এটা প্রতীক্ষালয়ের মত। এর পরবর্তী অবস্থান সর্বজনীন মহাপ্রলয় কিয়ামতোত্তর। কবর থেকে আর আমলের কোন সুযোগ নাই। এখানেই অর্জনের সুযোগ, যা পাওয়া যায়।

লেখক : আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসা,
খতিব : হযরত খাজা গরীব উল্লাহ শাহ (র.) মাজার জামে মসজিদ।

প্রবন্ধ

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের নির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

সমগ্র মানব জাতি এক আল্লাহর সৃষ্টি। সকলেই একই পিতা-মাতার সন্তান। সুতরাং মানুষ একই বংশধারায় উত্তরাধিকারী। ইসলামের মধ্যে পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের অধিকার বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যেখানে সকলের অধিকারের কথা বলার সাথে সাথে অধিকার হরণের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। মানুষের অধিকার হলো মানবাধিকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানবাধিকার রক্ষার কথা বলেছেন এবং বিশেষ করে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজ্বের ভাষণে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যা স্বয়ং নবিজীর যুগে, খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ও তাবেয়ীদের যুগে পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা প্রদান করেছি। আমি তাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

[সূরা বনি-ইসরাইল :৭০]

ইসলাম সকল মানুষকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাবান মনে করে। মানুষের মধ্যে জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষার পার্থক্য স্বীকার করেনা। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতিই মানুষের মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। [সূরা হুজুরাত: ১৩]

এই আয়াতটি অবতরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা জাহেলীয়া সমাজে প্রচলিত সকল গোত্রের অহংকারকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। কেউ কালো হাবশী হলেও তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে সর্বোচ্চ আসনে আসীন হতে পারে। মক্কা বিজয়ের পর হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ) কে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াজজিন নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি গোত্র অহংকার ভেঙ্গে দিয়ে মানুষ হিসেবে প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইসলামে মানবাধিকার

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লংঘন চলছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের কারণে প্রতিনিয়ত চলেছে মানুষের প্রাপ্য অধিকার হরণের নির্লজ্য প্রতিযোগিতা। ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম, যাতে মানবজাতির সর্বপ্রকার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে দীপ্ত উচ্চারণ করেছে। মানুষের মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ, আইন-কানুনসহ সর্ব প্রকার অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করার সাথে দুনিয়ার অন্যান্য অধিকার রক্ষার নির্দেশটি খুবই গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছেন। যার কারণে একজন মুসলিমকে এক আল্লাহর ইবাদত করার সাথে সাথে মানবাধিকারের দিকটি গভীর ভাবে প্রতিপালন করতে হয়। ইসলামে মানবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকেই বুঝায় যা স্বয়ং আল্লাহই তার বান্দাদেরকে দান করেছেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা তার পরিচয় প্রকাশ করে আপনজনদের সাথে কিছু করণীয় অধিকার নিশ্চিত করতে তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করোনা তার সাথে অন্য কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেননা দাম্ভিক-অহংকারীকে। [সূরা আন নিসাঃ ৩৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন-যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। [সূরা নাহল-৯০]

সম্পদ লাভের অধিকার

মেধা ও যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষ সমান নয়। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ হিকমতের কারণে বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। ইলসামে হালাল উপায়ে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতিকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ

তায়ালা বলেন হে মুমিনগণ! পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা করা ব্যতীত তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। [সূরা নিসা-২৯]

প্রিয় নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবী (উপার্জনকারী) মুমিনকে ভালোবাসেন। [তবরানী]

ইসলাম পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র নরীদের প্রতি নির্যাতন মূলক আচরণ প্রচলিত ছিল। সম্পদ লাভের কোনো অধিকার তাদের ছিলনা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে এই নির্যাতন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে নরীদের মর্যাদার কথাও ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- আর তোমরা আখাঙ্খা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে জ্ঞাত।

[সূরা আন-নিসা-৩২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে, আর এই যে তার কর্ম অচিরেই দেখান হবে। অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান।

[সূরা আন-নাজমঃ ৩৯-৪১]

মানসম্মান লাভের অধিকার

ইসলামের নবী রাহমাতুললিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করান যাতে সকল মানবের মর্যাদাকে যথাযথ স্থান দেওয়া হয়েছে। এখানে সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ, সক্ষম-অক্ষম সকলের জন্য যথোপযুক্ত অধিকার লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ কাউকে হেয় করবে না, ঠাট্টা-বিদ্রোপ করবে না এমনকি মন্দ নামেও ডাকতে পারবেনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যাতে অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। [সূরা হুজুরাত: ১১]

বিদায় হজের ভাষণে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে লোক সকল! পরস্পরের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের জন্য হারাম করা হলো। মরে রেখো! দেশ,বর্ণ-গোত্র সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ থেকে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো আল্লাহ ভীতি ও সৎকর্ম।

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কত সোচ্চার ছিলেন তা নিম্মোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায়। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মুসলমান মুসলামানের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না, অতঃপর তিনি তার বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাকওয়া এখানে। মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন সম্পদ ও সম্মান সবই সম্মানিত। [সহীহ মুসলিম-৬৩০৯]

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমান অধিকার

ইসলামে বিচারের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক, বাহুবল, পেশীশক্তি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর। এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন। [সূরা মায়েদা-৮]

একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুষঙ্গ হলো "ন্যায়বিচার"। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে লক্ষ করে বলেন,আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সাজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। [সূরা আ'রাফ-২৯]

ইসলামে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবল-দুর্বল, আশরাফ- আতরাফ ধণী-গরিব এর মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেনি বরং ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকলেই সমান। বানু মাখযুম গোত্রের ফাতেমা নামের এক মহিলার বিরুদ্ধে চুরির আপরাধ সাব্যস্থ হলো। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের বিধান অনুসারে তাকে হাত কাটার নির্দেশ প্রদান করেন। বিষয়টি কুরাইশদের জন্য একটু বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। ফলে তারা সকলেই একমত হয়ে নবিজীর প্রিয় পাত্র হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) কে সুপারিশ করার জন্য নবিজীর কাছে পাঠালেন। নবিজী তা প্রত্যাখ্যান করে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল প্রকৃতির কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ! যদি আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেয়ে ফাতিমার ব্যাপারেও এই অভিযোগ আসত তাহলে আমি তাকেও শাস্তি দিতাম। [সহীহ বুখারী]

অমুসলিমদের অধিকার

ইসলাম সকল ধর্মের মানুষকে সাম্য মৈত্রির বন্ধনে আবদ্ধ করে সর্বত্র শান্তি স্থাপন করেছে। অন্যায়ভাবে অন্য ধর্মের প্রতি বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহকে ছাড়া যাদের তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিওনা, কেননা তারা সীমলংঘন করে অজ্ঞানতাবসত আল্লাহকেও গালি দিবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভিত করেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্মন্ধে অবহিত করবেন। [সূরা আনআম-১০৮]

জীব-জন্তুর উপর মানুষের অধিকার

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণে অসংখ্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে তারাও আল্লাহর সৃষ্ট পরিবারের সদস্য। মানুষের কর্তব্য হলো প্রাণীদের অধিকার সংরক্ষণ করা, তাদের প্রতি স্নেহশীল আচরণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল জীব এবং নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখি তারা সকলেই তোমাদের মতই এক একটি জাতি। [সূরা আনআম-৩৮]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও, অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য। [সূরা তা-হা: ৫৪]

যে প্রাণীগুলোকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষই অনেক সময় তাদের অধিকার ক্ষুন্ন করে অযথা পশু পাখি হত্যা করে। অনেক সময় খাদ্যের অভাব দেখা দিলে বনের নিরীহ প্রাণী লোকালয়ে চলে আসে। বন ধ্বংসের কারণে বিভিন্ন জায়গায় বন্য হাতি, হরিণ, বাঘ মানুষের হত্যার স্বীকার হয়। রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সে সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! তার অধিকার কী? তিনি বললেন, তার অধিকার হলো তাকে যথানিয়মে জবেহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেঁটে নিক্ষেপ না করা। [সুনানে নাসায়ী: ৪৩৪৯]

লেখক: সহকারি শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

বিশুদ্ধ উচ্চারণ কুরআন তেলাওয়াতের পূর্ব শর্ত

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

সৃষ্টিকূলের ওপর যেমন স্রষ্টার সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম, তেমনি তাঁর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভীষিকাময় জাহেলি সমাজে কুরআন এনেছিল আলোকময় সোনালি সকাল। মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, তার মধ্যে এ কুরআন পাঠ সর্বাধিক উত্তম। আলোচ্য নিবন্ধে বিশুদ্ধ পন্থায় কুরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গে আলোকপাত করার প্রয়াস পেলাম।

আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা প্রত্যেকেই এমনভাবে কুরআন পড় যেভাবে তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।'[১] অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং পরবর্তী উম্মতকে সাহাবাগণ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আর উক্ত পরম্পরা যেভাবে শুদ্ধভাবে চলে আসছে, সেভাবেই পড়তে হবে। তাই প্রতিটি হরফ স্বীয় মাখরাজ থেকে সিফাতে লাজেমাসহ উচ্চারণ করে মদ-গুন্নাহ আদায় করেই কুরআন পড়তে হবে। এই কোরআন পড়ার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন তথা ব্যাকরণ রয়েছে, কুরআনের পরিভাষায়-এই নিয়ম-কানুনকে বলা হয় তারতিল। 'তারতিল' মানে মদ ও গুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, ধীর- স্থীরে কোরআন মজীদ পড়া। ইরশাদ হচ্ছে-

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরস্থির ভাবে, স্পষ্টরূপে।[২] হাদীস শরীফে রয়েছে-

زينوا القرآن بأصواتكم

অর্থাৎ সুন্দর সূরের মাধ্যমে কুরআনকে (এর তিলাওয়াতকে) সৌন্দর্যমন্ডিত কর।[৩] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ইরশাদ করেন, (কিয়ামতের দিন) কুরআনের তিলাওয়াতকারী বা হাফেজকে বলা হবে-

اقْرَأ،وَارْتَقِ،وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا،فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.

তিলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। ধীরে ধীরে তিলাওয়াত কর, যেভাবে ধীরে ধীরে দুনিয়াতে তিলাওয়াত করতে। তোমার অবস্থান হবে সর্বশেষ আয়াতের স্থলে যা তুমি তিলাওয়াত করতে।[৪] এই ধীরস্থির বা তারতীলের সাথে তিলাওয়াত কেমন হবে তা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে গেছেন, শিখিয়ে গেছেন। হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ও তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল-প্রতিটি হরফ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারিত।[৫] অর্থাৎ কোনো জড়তা, অস্পষ্টতা ও তাড়াহুড়া ছিল না। তাই কোরআন তাড়াতাড়ি বা দ্রুতগতিতে না পড়াই শ্রেয়। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ মাখরাজের সহিত সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ মাহাত্ম রয়েছে। তা হলো, এক একটি আয়াত পড়ে থামলে বা বিরতি নিলে মন আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ ও তার দাবীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে এবং তার বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হবে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের ওপর খেয়াল রাখতে হবে। একটি হলো মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান। প্রতিটি ধ্বনি বাক প্রত্যঙ্গের ঠিক কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হবে সেটি জানতে হবে। আরেকটি হলো- সিফাত বা শব্দের অবস্থা ও গুণাবলি অনুযায়ী উচ্চারণ করা। কোরআন তেলাওয়াতের এই ব্যাকরণকে উসূলের পরিভাষায় তাজবিদ বলা হয়। তাজবিদ জানার কোনো বিকল্প নেই। কোরআনকে সুন্দর করে সুরেলা কণ্ঠে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কোরআন দেখে দেখে পড়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণটা হলো, কোরআনের আয়াতের দিকে তাকালে এবং কানে সেই দেখা আয়াতের তেলাওয়াত শুনলে চোখ এবং কানের ওপর তার প্রভাব

---

1 - ফাজায়েলুল কোরআন, কাসেম ইবনে সালাম, পৃ. ৩৬১

2 - সূরা মুযযাম্মিল,আয়াত : ৪

3 - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ১৪৬৮

4 - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস :১৪৬৪; জামে তিরমিযী, হাদীস :২৯১৪

5 - জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৯২৩

পড়ে। সেই প্রভাব চূড়ান্তভাবে অন্তরে গিয়ে আসন গাড়ে। সূফি আলেমরা বলেছেন, দেখে দেখে কুরআন তেলাওয়াত করলে চোখের অসুখ বা ব্যাথা বেদনা ভালো হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্যও এমনই ছিল। ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করতেন তাঁরা। নিজেরা করতেন, অন্যদেরকেও তাগিদ দিতেন। হযরত আলকামা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাচ্ছিলেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। (কিন্তু তিনি কিছুটা দ্রুত পড়ে যাচ্ছিলেন) তখন ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আমার বাবা-মা তোমার উপর কুরবান হোক! ধীরস্থিরভাবে তারতীলের সাথে তিলাওয়াত কর। এটা কুরআনের (তিলাওয়াতের) ভূষণ।[৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এক ব্যক্তি বলল, আমি এক রাকাতেই মুফাস্সালের [সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত[৭]] সব সূরা পড়ে নিই। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তখন বললেন, এটা তো কবিতা আওড়ানোর মত পাঠ করা। অনেক মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালির নিচেও যায় না। অথচ কুরআন তিলাওয়াত তখনই (পরিপূর্ণ) উপকারী হয় যখন তা অন্তরে গিয়ে বসে।[৮] অন্যত্র রয়েছে, "তোমরা কবিতা পাঠের মত গড়গড় করে দ্রুত কালামে পাক তিলাওয়াত করো না এবং নষ্ট খেজুর যেমন ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হয় তেমন করে পড়ো না বরং এর বিস্ময়কর বাণী ও বক্তব্যগুলোতে এসে থেমে যাও, হৃদয়কে নাড়া দাও। এ ভাবনা যেন না থাকে যে, এ সূরা কখন শেষ হবে!"[৯] আল্লামা যারকাশী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তারতীল মানে কুরআনের শব্দগুলো ভরাট উচ্চারণে পাঠ করা এবং হরফগুলো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। অন্যথায় এক হরফ আরেক হরফের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। কারো কারো মতে এটা তারতীলের সর্বনিম্ন মাত্রা।

কুরআন তেলাওয়াতের আদাব

কোরআন পাঠ করতে হয় যথাযথ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আদব সহকারে। এক্ষেত্রে শিষ্টতাপূর্ণ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। এগুলোর কোনোটা বাহ্যিক আবার কোনো কোনোটা অভ্যন্তরীণ। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. নিয়্যত শুদ্ধ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের ওপর আগুনের শাস্তি কঠোর করা হবে বলে জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ওই ক্বারী, যিনি ইখলাসের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।[১০]

২. পবিত্র হয়ে অজু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা। অজু ছাড়াও মুখস্থ কুরআন পড়া যাবে, তবে তা অজু অবস্থায় পড়ার সমান হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে - 'পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ এ কোরআন স্পর্শ করতে পারে না।'[১১]

৩. কুরআন তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক করা। মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের মুখগুলো কুরআনের পথ। তাই সেগুলোকে মিসওয়াক দ্বারা সুরভিত করো।'[১২] তার মানে কোরআনের আধ্যাত্মিক গুণে যিনি সমৃদ্ধ হতে চান তার উচিত আত্মিক পবিত্রতা এবং আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪. তিলাওয়াতের শুরুতে আউজুবিল্লাহ পড়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে, তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাও।'[১৩]

৫. বিসমিল্লাহ পড়া। তিলাওয়াতকারীর উচিত সূরা তাওবা ছাড়া সব সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সূরা শেষ করে বিসমিল্লাহ বলে আরেক সূরা শুরু করতেন। শুধু সূরা আনফাল শেষ করে সুরা তাওবা শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়তেন না।

৬. তারতিলের সঙ্গে (ধীরস্থিরভাবে) কূরআন পড়া। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা তারতিলের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত করো।'[১৪]

৭. সুন্দর করে মনের মাধুরী মিশিয়ে কুরআন পড়া। হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এশার

---

6 - মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ১৩১

7 - ফাতহুল বারী ২/২৫৮

8 - সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮২২

9 - মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস :৮৮২৫

10 - জামে তিরমিযি, হাদিস : ২৩৮২; সহিহ ইবন হিব্বান, হাদিস : ৪০৮

11 - সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৭৯

12 - সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৯১

13 - সুরা নাহল, আয়াত : ৯৮

14 - সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ৪

নামাজে সূরা ত্বিন পড়তে শুনেছি। আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠে আর কাউকে তিলাওয়াত করতে শুনিনি।'[১৫]

৮. সুর সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা। এটি সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের অংশ। হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সে আমার উম্মত নয়, যে সুর যোগে কুরআন পড়ে না।'[১৬]

৯. রাতে ঘুম পেলে বা ঝিমুনি এলে তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,'যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাজ পড়ে, ফলে তার জিহ্বায় কুরআন এমনভাবে জড়িয়ে আসে যে সে কী পড়ছে তা টের পায় না, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।'[১৭] অর্থাৎ তার উচিত এমতাবস্থায় নামাজ না পড়ে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া, যাতে তার মুখে কুরআন ও অন্য কোনো শব্দের মিশ্রণ না ঘটে এবং কুরআনের আয়াত এলোমেলো হয়ে না যায়।

১০. ফজিলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,'তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াতে অক্ষম? সাহাবাগণ বললেন, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়া যাবে! তিনি বলেন, 'সুরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।'[১৮]

১১. ধৈর্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা। যিনি অনায়াসে কুরআন পড়তে পারেন না, তিনি আটকে আটকে ধৈর্যসহ পড়বেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কুরআন পাঠে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, সে সম্মানিত রাসূল ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তোতলাতে তোতলাতে সক্লেশে কুরআন তিলাওয়াত করবে, তার জন্য দ্বিগুণ নেকি লেখা হবে।'[১৯]

১২. কুরআন তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা। আল্লাহ তাআলা তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দনরতদের প্রশংসা করে বলেন, 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'[২০] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমাকে তুমি তিলাওয়াত করে শোনাও। বললাম, আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, অথচ আপনার ওপরই এটি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। অতঃপর আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। যখন আমি সূরা নিসার ৪১ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করলাম, তিনি বললেন, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।[২১] আয়াতটি হলো, 'যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের ওপর সাক্ষীরূপে, তখন কী অবস্থা হবে?' হযরত কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি দেখেন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা একটি আয়াত বারবার আবৃত্তি করছেন আর কেঁদে কেঁদে দোয়া করছেন। আয়াতটি হলো, 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।'[২২] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। আয়াতটি হলো, 'আর মৃত্যুর যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, যা থেকে তুমি পলায়ন করতে চাইতে।'[২৩]

---

15 - সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৫৪৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৬৭

16 - সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৫২৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৭১

17 - সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৮৭২; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৮২১৪

18 - সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯২২; সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০১৫

19 - সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৯৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৮৯৮

20 - সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১০৯

21 - সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৫০; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯০৩

22 - সূরা তুর, আয়াত : ২৭

23 - সুরা : ক্বফ, আয়াত : ১৯

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন এ আয়াতটি পড়তেন, তখনই তিনি কান্নাকাটি করতেন। আয়াতটি হলো, '...আর তোমাদের মনে যা আছে, তা যদি তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন...।'[২৪] মূল কথা হলো, কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্নাকাটি করা এবং চোখে পানি আসা ঈমানের নিদর্শন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কুরআনের পাঠকদের মধ্যে ওই ব্যক্তির কণ্ঠ সর্বোত্তম, যার তিলাওয়াত কেউ শুনলে মনে হয় যে সে কাঁদছে।'[২৫]

১৩. কুরআন তিলাওয়াতের আরেকটি আদব হলো এর মর্ম নিয়ে চিন্তা করা। এটিই তিলাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব। তিলাওয়াতের সময় চিন্তা-গবেষণা করাই এর প্রকৃত সুফল বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[২৬] ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন, তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা অনুচিত। হাদিস শরিফে এসেছে, 'তিন দিনের কম সময়ে যে কুরআন খতম করবে, সে কুরআন বুঝবে না।'[২৭] যায়েদ বিন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে একজন জিজ্ঞেস করলো, সাত দিনে কুরআন খতম করাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন? তিনি বলেন, এটা ভালো। অবশ্য আমি এটাকে ১৫ দিনে বা ১০ দিনে খতম করাই পছন্দ করি। আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, তা কেন? তিনি বলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যাতে আমি তার স্থানে স্থানে চিন্তা করতে পারি এবং থামতে পারি।'

১৪. তিলাওয়াতের সময় সিজদার আয়াত এলে সিজদা দেওয়া। সিজদার নিয়ম হলো, তাকবির দিয়ে সিজদায় চলে যাওয়া।

১৫. যথাসম্ভব আদবসহ বসা। আর বসা, দাঁড়ানো, চলমান ও হেলান দেওয়া সর্বাবস্থায় তিলাওয়াত করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে...।'[২৮]

১৬. কুরআন তেলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। ইরশাদ হচ্ছে - 'যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।'[২৯]

বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করার গুরুত্ব

রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে ও অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়।'[৩০] তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, 'যারা সহি শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে, তারা নেককার সম্মানিত ফেরেশতাদের সমতুল্য মর্যাদা পাবে এবং যারা কষ্ট সত্ত্বেও কুরআন সহি শুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা ও মেহনত চালিয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।'[৩১] অন্যত্র রয়েছে, 'যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানী হবে, কিয়ামতের দিন সে সম্মানিত ফেরেস্তাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে কুরআন শেখার চেষ্টা করবে, শিখতে শিখতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ শেখার জন্য সে চেষ্টা করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।'[৩২] বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে যখন আপনজন ও ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না, তখন কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন,রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।'[৩৩] অন্যত্র রয়েছে

24 - সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৪
25 - সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৩৯
26 - সূরা ছ্বাদ, আয়াত : ২৯
27 - সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৩৯৬
28 - সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১
29 - সূরা আরাফ,আয়াত :২০৪
30 - সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৫২
31 - সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৫৮
32 - সহিহ বুখারি
33 - সহিহ মুসলিম

, 'কিয়ামতের দিন কুরআন তার তেলাওয়াতকারী ও আদেশ-নিষেধ মান্যকারীকে বলবে, আমাকে চিনতে পারছো? আমি সেই কুরআন যে তোমাকে রোযার আদেশ দিয়ে দিনে পিপাসার্ত আর রাতে নামাযে রত রেখেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ীই তার ব্যবসার মাধ্যমে লাভবান হতে চায়। আজ তুমি সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছ। তারপর ওই বান্দার ডান হাতে বাদশাহি, বাম হাতে জান্নাতে বসবাসের পরোয়ানা দেওয়া হবে। মাথায় নূরের তাজ পরানো হবে এবং বলা হবে, কুরআন পড়তে থাকো আর উচ্চ মকামে উঠতে থাকো।'[৩৪]

নামাযে কুরআন তেলাওয়াত

নামাযে আমরা কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি নামাযের ফরয বিধান হিসাবে। কুরআন তিলাওয়াতের যে আদবসমূহ উপরে আলোচিত হল সেগুলো নামাযে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। নামাযে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা ও ভাবগাম্ভীর্য আরো বেশি মাত্রায় থাকতে হবে। তখন এগুলো শুধু তিলাওয়াতের বিষয় হিসাবেই থাকে না বরং এই ধীরস্থিরতা ও আত্মনিমগ্নতা নামাযেরও বিষয়। নামাযের খুশু-খুযুর জন্য তিলাওয়াত তারতীলের সাথে হওয়া খুব জরুরি। তাছাড়া এত দ্রুত তিলাওয়াতের কারণে মদ্দ-গুন্নাসহ তাজবীদের অনেক কায়েদা লঙ্ঘিত হয় এবং হুরফের ছিফাতের প্রতিও যথাযথ লক্ষ্য রাখা যায় না, ফলে দ্রুত পড়তে গিয়ে ص এর জায়গায় س হয়ে যাওয়া, ش এর জায়গায় س হয়ে যাওয়া, ط এর জায়গায় ت হয়ে যাওয়া কিংবা যেখানে টান নেই সেখানে টান হয়ে যাওয়া বা কোথাও টান আছে সেখানে টান না হওয়া (দ্রুত পড়তে গেলে এই টানের ভুল সব চেয়ে বেশি হয়) খুব সহজেই ঘটে যেতে পারে। মোটকথা নামাযে দ্রুত তিলাওয়াত করতে গিয়ে নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত ভুল যদি নাও হয় বরং শুধু যদি এটুকু হয় যে, উচ্চারণে মাকরূহ পর্যায়ের বিঘ্ন ঘটছে তাহলে সেই নামাযও কি ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ল না? আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ সকল উচ্চারণ ঠিক রেখে খুব দ্রুত পড়ে যেতে পারেন তার জন্যও তো নামাযে অন্তত এমনটি না করা উচিত। কারণ তাতে কুরআন তিলাওয়াতের নূনতম আদবটুকুও যেমন রক্ষিত হয় না তেমনি নামাযে খুশু-খুযু রক্ষা করাও সহজ হয় না।

ফরয নামায ও অন্যান্য নামাযে আমরা কিছুটা ধীরস্থির তিলাওয়াত করে থাকি। কিন্তু রমযানে তারাবীতে এত দ্রুত পড়ে থাকি, এতই দ্রুত যে তারতীলের ন্যূনতম মাত্রাও সেখানে উপস্থিত থাকে না। মদ্দ (টান), গুন্নাহ ও শব্দের উচ্চারণ বিঘ্নিত হয়ে তিলাওয়াত মাকরূহ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে; বরং অর্থের পরিবর্তন হয়ে নামায নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের অজান্তেই। আর খুশু-খুযু, ধ্যানমগ্নতা তো নষ্ট হচ্ছেই। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সুমহান কালাম পড়ছি বা শুনছি এমন ভাব-তন্ময়তা তো দূরের কথা কখন বিশ রাকাত তারাবী শেষ হবে এই চিন্তাই যেন সকলকে তাড়িত করতে থাকে। নামায বা তিলাওয়াতের যে আদবটুকু ফরয নামাযে রক্ষা হয় তারাবীতে সেটুকু পাওয়াও দুষ্কর। দ্রুত তিলাওয়াত, দ্রুত রুকু, সেজদা, দ্রুত তাসবীহ। অনেকের মাঝে ধারণা জন্মে গেছে, তারাবী মানেই তাড়াতাড়ি পড়া। যার কারণে দেখা যায় যে, যারা 'সূরা'-তারাবী পড়েন তারাও ভীষণ দ্রুত পড়েন। অনেকেই মুসল্লিদের কষ্টের কথা বলে থাকেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, ধীরস্থিরভাবে বিশ রাকাত নামায পড়ার কারণে যতটুকু কষ্ট-ক্লান্তি আমাদের হয় তার চেয়ে বেশি হয় কিয়াম, রুকু, সেজদা, তাসবীহ দ্রুত করার কারণে। দুই রাকাত শেষে সালাম ফিরিয়েই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যাওয়া। চার রাকাত পড়ে খুব সামান্য একটু সময় বসে আবার শুরু করা। অথচ সালাফে সালেহীনের আমল ছিল তার বিপরীত, যা আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি। কেননা, হাদীস শরীফে কাকের ঠোকরের মত রুকু, সেজদা করা থেকে শক্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মূলত তিলাওয়াত ধীরে করে কিয়াম একটু লম্বা করলে, রুকু, সেজদায় সময় নিলে এবং উঠাবসায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলে কষ্ট অনেকেই কমে যায়। বয়স্কদের কথা যদি বলেন তাদের জন্য তো ধীরস্থিরতাই সহজ। তাছাড়া বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য কেরাত ছোট করার কথা হাদীসে রয়েছে। তাড়াতাড়ি করার কথা তো নেই! এদের যদি খতম তারাবী একেবারেই কষ্ট হয়ে যায় তাহলে সূরা তারাবী পড়তে পারেন। আর তারাবীর নামায যেমন গুরুত্বপূর্ণ আমল তেমনই ফযীলতপূরণ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًاوَاحْتِسَابًا، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে, সওয়াবের আশায় রমযানে কিয়াম করে (তারাবী, তাহাজ্জুদ সবই এর অন্তর্ভুক্ত)

[34] - মুসনাদে আহমদ

আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৩৫] অন্যত্র রয়েছে-...সে যাবতীয় গুনাহ থেকে নবজাত শিশুর মত পবিত্র হয়ে যাবে।[৩৬]

নামাযে অশুদ্ধ কেরাত পড়ার বিধান

নামাযের কেরাতে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, এমন ভুল পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। চাই তা তিন আয়াত পরিমাণের ভেতর হোক বা পরে হোক- সর্বাবস্থায় একই হুকুম। পক্ষান্তরে সাধারণ ভুল- যার দ্বারা অর্থ একেবারে বিগড়ে যায় না, তাতে নামাজ নষ্ট হবে না।[৩৭] কিন্তু সুরা-কেরাত ও নামাযের তাসবিহ ইত্যাদি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত নামায ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি নেই। সূরা-কেরাতও শুদ্ধ করতে থাকবে এবং নামাযও আদায় করতে থাকবে, তবে এ ধরনের লোকেরা শুদ্ধ পাঠকারী ব্যক্তির ইমামতি করবে না।[৩৮]

কেরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের যে কোন একটি হরফ পড়ে বা শ্রবণ করে, সে দশটি সওয়াব পায়। তার দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতে তার মর্যাদা দশ ধাপ এগিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নামাযে বসাবস্থায় কুরআন পড়ে, প্রতিটি হরফের বদলে সে ৫০টি করে সওয়াব, ৫০টি করে গুনাহ মাফ এবং জান্নাতে ৫০ ধাপ করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন পড়ে, সে প্রতি হরফের পরিবর্তে একশ একশ করে সওয়াব লাভ করে, একশটি করে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এবং জান্নাতে তার মর্যাদা একশ ধাপ করে এগিয়ে যায়। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সূরা ফাতিহা শ্রবণ করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে শুরু থেকে জিহাদে শরীক হয়ে একেবারে শত্রুর দেশ জয় করে এসেছে। তথা সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার শেষের দিকে এসে শরীক হয় সে ঐ ব্যক্তির মত যে জিহাদের অংশ গ্রহণ করেনি কিন্তু বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সময়ে এসে উপস্থিত হল। পার্থক্যটা নিচের ঘটনা থেকে স্পষ্ট আকারে ফুটে উঠবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে একটি বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহিনীর সবাই জিহাদে চলে গেলেন, কিন্তু তিনি এই ভয়ে জিহাদে যাননি, যে হয়তো আমি শহীদ হয়ে যাব আর কখনো রাসূলের পিছনে জুমা পড়ার সুযোগ পাব না। অর্থাৎ শুধু রাসূলের পিছনে জুমার নামায পড়ার আশায় জিহাদে যাননি। জুমার পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন জিহাদে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন- তিনি ধারণাটাকে দ্বিতীয়ববার ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আমি এখনই যাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুল্লাহ! বাহিনীর অন্যান্য সদস্য এবং তোমার মাঝে পাঁচ শত বছরের পার্থক্য হয়ে গেল। অর্থাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোমার এবং তাদের মাঝে এত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হল।[৩৯]

বর্তমানে অনেক লোককে দেখা যায় তারা বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন পাঠ করে থাকেন অথচ আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় কুরআন পাকের সঠিক উচ্চারণ অসম্ভব, তাই কুরআন পাককে অন্য ভাষায় লেখা বা পড়া উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে নাজায়েজ। এতে কোরআনের শব্দ ও অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ হারাম।[৪০] আবার অনেক লোককে দেখা যায় তারা কুরআন শুদ্ধ করার চেয়েও কুরআনের অর্থ বুঝতে বেশি আগ্রহী। অর্থ বোঝা যদিও একটি জরুরি কাজ, কিন্তু সবার আগে জরুরি হলো তেলাওয়াত শুদ্ধ করা। এটি হলো ফরজে আইন, এর ওপর নামাজ শুদ্ধ হওয়ার ভিত্তি। প্রত্যেক নর-নারীর ওপর কোরআন এতটুকু সহিহ শুদ্ধ করে পড়া ফরজে আইন, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয় না। অর্থ পরিবর্তন হয়, এমন ভুল পড়ার দ্বারা নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য যে সুরাগুলোর প্রয়োজন, সেগুলো শুদ্ধ করে নেওয়া আবশ্যক, অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।

[মুকাদ্দামায়ে জাজারিয়া, পৃ. ১১]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে নির্ভুল কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফিক দান করুন, আমিন বিহুরমাতি সৈয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখকঃ আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল-আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম

35 - সহীহ বুখারী, হাদীস :২০০৯

36 - সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২২১০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩২৮

37 - খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১১৮, ফাতাওয়া কাজি খান ১/৬৭

38 - হিদায়া ১/৫৮, জাওয়াহিরুল ফিক্হ ১/৩৩৯

39 - মিশকাতুল মাসাবীহ

40 - আল ইতকান, পৃ. ৮৩০

প্রবন্ধ

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে করণীয়

খন্দকার ফারজানা রহমান

দ্বিমত করার কোনো উপায় নেই যে, বাংলাদেশে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ, কিশোর-কিশোরীদের ঘরে বসে সময় কাটাতে হচ্ছে। বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যরা সেই সময়কে বিনোদনমুখর করে তোলার জন্য সন্তানদের হাতে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ট্যাব, অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইত্যাদি তুলে দিচ্ছেন। ফলে এসব শিশু-কিশোর ইউটিউব, ভায়োলেন্ট (সহিংসতা উসকানিমূলক) গেমস, পর্নোগ্রাফি ও সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং এ আসক্তিই মূলত তাদের মাঝে ডেভিয়্যান্ট বিহ্যাভিয়ার (Deviant Behavior) বা সমাজবিচ্যুত ব্যবহারকে প্ররোচিত করে। এ ছাড়া আমরা গঠনমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে তাদের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত করতে পারছি না, ফলে তারা নেতিবাচক ও সমাজবিচ্যুত কাজে আরও বেশি জড়িত হয়ে পড়ছে। স্বভাবতই অনেক সময় বাবা-মা প্রাইভেসি বা পারসোনাল স্পেসের নামে সন্তানদের আলাদা কক্ষ দিচ্ছেন এবং সেখানে তারা কী করছে তা খেয়ালও রাখছেন না। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি পরিবারের এবং খুব নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বাবা-মারই প্রধান দায়িত্ব সন্তানদের গতিপ্রকৃতি দেখাশোনা অথবা বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা বা সুপথে পরিচালিত করা।

একজন শিশু বা কিশোরের বেড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায় তার কিশোর অপরাধী হওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করতে পারে। যেমন বাবা-মায়ের মধ্যে যদি সব সময়ই উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, তাদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্মানসূচক সম্পর্ক না থাকে তারা যদি সব সময়ই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকেন; তাহলে সন্তানরা নেতিবাচক ব্যবহার থেকে এ ধরনের আচরণ শিখেই বড় হয়। একে আমরা বলি 'সোশ্যাল লার্নিং থিওরি' (Social Learning Theor), যেখানে মূলত শিশুরা তাদের বেড়ে ওঠার সময় আশপাশের মানুষের ব্যবহার ও কাজগুলো দেখে এবং শেখে। তার ব্যবহারের একটি বড় অংশ হলো 'সোশিয়ালি লার্নেড বিহ্যাভিয়ার' (Socially Learned Behaviour) বা সামাজিকভাবে শেখা আচরণ, যা তারা অর্জন করে অভিভাবক, সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমাজব্যবস্থা থেকে। একইভাবে পরিবারের ভিতরে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক এবং বাবা-মার প্রতিক্রিয়াশীল (responsive) প্যারেন্টিং সন্তানদের দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে বিভিন্নমুখী মেলামেশা (Differential Association) তত্ত্বানুযায়ী আইন-শৃঙ্খলাবদ্ধ রীতিনীতি বা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যেমন শেখানো হয় তেমন অপরাধমূলক আচরণও শেখানোর মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং এ শিখন কার্যক্রমটি বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা অথবা অন্তরঙ্গ দলগত সম্পর্কের মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীতিবহির্ভূত আচরণ সামাজিকীকরণ করা যায়। অর্থাৎ পরিবারের বাইরেও কিশোররা বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে অনেক সময় অপরাধমূলক আচরণের শিক্ষা পায়।

এবার আসা যাক সামাজিক গণ্ডির বাইরে আর কী কী সংগঠন কিশোর অপরাধ বিস্তারে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। এক গবেষণায় দেখলাম, ঢাকার ১০টি কুখ্যাত কিশোর গ্যাংয়ের আটটিই দুর্বৃত্ত রাজনীতির 'বড় ভাইদের' সঙ্গে জড়িত। কি ভয়ংকর! এসব সন্তান বয়সের প্রাণশক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে রাজনৈতিক বা এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা এবং প্রভাবের বলি হচ্ছে। ১৮ বছর বা তার চেয়েও কম বয়সী কিশোররা ভালো খারাপ কাজের পরিণাম কী হতে পারে তা বোঝে না। ফলে কিশোর-কিশোরীদের অপরিপক্ব মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে একদল লোক বিশেষত স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের একটি অংশ তাদের অবস্থান ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করে। পেশিশক্তি আমাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নোংরা অনুশীলনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য থাকে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে নেতাদের কাছে একটি পলিটিক্যাল ইমেজ (Political Image) তৈরি। তা করতেই তারা কিশোর দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন মনোভাব ও প্রক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে কিশোর

অপরাধীদের অনৈতিক চর্চা এবং অপরাধকর্ম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেয়।

এখন আসা যাক আমাদের বিচারব্যবস্থায়। যদি কোনো কিশোর বা কিশোরী আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাকে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। তবে কিশোর অপরাধীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার তুলনায় এ জাতীয় কেন্দ্রের সংখ্যা দেশে কখনই পর্যাপ্ত নয়। সারা দেশে কেবল তিনটি সংশোধন কেন্দ্র রয়েছে। তার ওপর আমাদের কিশোর সংশোধন কেন্দ্রগুলোয় অসংখ্য সমস্যাও কম নয়। এ কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সঠিক পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা সংশোধন পদ্ধতি অনুসরণ করে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে সমাজে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তবে অভিযোগ রয়েছে, এ কিশোর-কিশোরীদের সংশোধনের পরিবর্তে এসব কেন্দ্রের কর্মকর্তারা তাদের নানাভাবে মানসিক নির্যাতন করেন। তাদের পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করেন না। একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে একদল কিশোর অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল। আবার একজন মেয়ে সংশোধন কেন্দ্রে তার ওপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। মূলত দুর্বল প্রশাসনিক সহযোগিতা, অপর্যাপ্ত লজিস্টিক সহায়তা, যথাযথ কাউন্সেলিং এবং দুর্নীতি ও জবাবদিহির অভাবে এ জাতীয় সমস্যা ঘটেই চলছে।

অধিকাংশ উঠতি বয়সীর বিপথগামী হওয়ার জন্য আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ দায়ী। রাজনৈতিক নেতাদের দায় রয়েছে, তবে অভিভাবকদের দায়দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আমি মনে করি কিশোর অপরাধ নির্মূলে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পরিবারের। কারণ পরিবারই একটি শিশুর বেড়ে ওঠার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার যদি তার সন্তানদের ব্যবহার ও আচরণ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে, সন্তানের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কী কী দরকার সে অনুযায়ী তাদের লালনপালন করে তাহলে সেগুলো একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একটি পরিবারের প্রবীণদের উচিত অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, নৈতিকতা শেখানো এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের ওপর নজর রাখা।

আমাদের বর্তমান সমাজে পাঠাগার, বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কার্যক্রম কমে গেছে এবং তাকে দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন ও আধুনিক প্রযুক্তি। ফলে বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক আয়োজন বাড়াতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের সামাজিকীকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কারণে কিশোর অপরাধ রোধ করার দায়বদ্ধতার একটি বড় অংশ স্কুলব্যবস্থার ওপর পড়ে বলে ধারণা করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার যা বিদ্যালয়গুলোকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, বিদ্যালয়গুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব ও তাদের সেলফ-ইমেজ উন্নত করার জন্য একটি সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করবে, যা তাদের সাফল্য ও অসামাজিক আচরণ প্রতিরোধের জন্য উৎসাহ প্রদান করবে। সহিংস আচরণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং কিশোর অপরাধমূলক আচরণের ঝুঁকি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও জ্ঞানভিত্তিক বিকাশের দিকেও মনোনিবেশ করা উচিত। এ ছাড়া ইতিমধ্যে আচরণগত সমস্যা প্রকাশ পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা অবশ্যই থাকতে হবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রকে শিশুবান্ধব নীতি তৈরি ও তা কার্যকর করতে হবে বলে আমি মনে করি। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন সাধন ও সেখানে শিশুর চারিত্রিক উন্নয়নমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিশুর জন্য উপযোগী বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলে কিশোর অপরাধ কমে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তার ওপর নীতিনির্ধারকদের মূল কারণগুলো শনাক্ত ও উত্তরণের উপায়ের জন্য বিশদ (comprehensive) গবেষণা এবং পরিকল্পনা (master plan) গ্রহণ সময়ের দাবি। কেননা ভুল পথে যাওয়া কিশোরদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বও অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।

[সৌজন্যে: বাংলাদেশ প্রতিদিন]

লেখক : চেয়ারম্যান ও সহকারী অধ্যাপক
ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধ

করোনা প্রতিরোধে অজু

কুতুবউদ্দিন চৌধুরী

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস নামক একটি ঘাতক সংক্রামক মহামারী রোগ সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বকে এক ধরনের যুদ্ধাবস্থার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। এ জাতীয় মহামারী বিশ্বের মানুষ ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করেনি। দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে এই মহামারী হানা দেয়নি। তবে রোগের কোনো ওষুধ অথবা এর সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনো প্রতিষেধক এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। ইতোমধ্যে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ছাড়াও কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। উন্নত রাষ্ট্রগুলো সর্বশক্তি নিয়োগ করে অদৃশ্য এ ভাইরাসের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আশানুরূপ কোনো ফল মেলেনি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগের সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুখে মাস্ক ব্যবহার, দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং সর্বোপরি ঘন ঘন হাত ধোয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য অফিস-আদালত এবং জনবহুল বিপণি কেন্দ্রে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন করা হয়েছে। মোট কথা, ভাইরাস সংক্রমণ রোধের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ'। মহান আল্লাহ পাক 'উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জনের জন্য 'অজু' নামক একটি বিধান রেখে গেছেন, যা দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। একজন মুমিনের নামাজ আদায়ের প্রথম স্তর হলো 'অজু'। 'অজু' করাও ফরজ হিসেবে নির্ধারিত। 'অজু' একটি আরবি শব্দ। শরীরের অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোতে বায়ুমণ্ডলে বিরাজমান ধুলোবালির সাথে রোগজীবাণু অতি সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। নাক, কান, ঠোঁট, জিহ্বা এসব দিয়ে রোগ জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। এ জন্য শরীরের যে অঙ্গগুলো সাধারণত অনাবৃত অর্থাৎ খোলা থাকে সেই বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ পাকের নির্দেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত অনুসরণে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধোয়ার নাম 'অজু'। আল্লাহ তায়ালা অজুতে চারটি কাজ ফরজ করেছেন। ১. দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া; ২. সমগ্র মুখমণ্ডল ধোয়া; ৩. পায়ের গিঁট অর্থাৎ টাখনু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়া ও ৪. মাথা একভাগ মাসেহ করা।

উপরোক্ত চারটি ফরজের সাথে আরো ১০টি কাজ সংযোজন করেছেন যেগুলো সুন্নত নামে অভিহিত। এগুলো হলো– ১. 'বিসমিল্লাহ' বলে অজু শুরু করা; ২. কব্জিসহ দুই হাত ধোয়া; ৩. কুলি করা; ৪. নাকের ভেতরের নরম অংশ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধোয়া; ৫. মেসওয়াক করা; ৬. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা; ৭. কান মাসেহ করা; ৮. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া ও ৯-১০. হাত ও পায়ের আঙুল খিলাল করা।

অজুতে যেসব অঙ্গ ধোয়া ফরজ ও সুন্নত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, রোগ জীবাণুর সংক্রমণ থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সেগুলো অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত বলে চিকিৎসক ও দেহবিদদের কাছে প্রমাণিত। কর্মজীবী মানুষ অফিস-আদালত, কল-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং চাষাবাদে, আর মহিলারা রান্না-বান্না, শিশুর পরিচার্যাসহ প্রতিটি কাজে হাত দিয়ে শুরু ও শেষ করতে হয়। অজুর শুরুতে হাতের কব্জি ও কনুই পর্যন্ত ধোয়ার ফলে ময়লা আবর্জনা ও রোগ জীবাণুমুক্ত হাত দিয়ে অজুর পরবর্তী স্তরগুলো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে থাকে। মেসওয়াক ও কুলি করলে মুখের ভেতরে জিহ্বা ও দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাদ্য কণা পরিষ্কার হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধোয়ার ফলে চোখের পাতা, ভ্রূ এবং পুরুষের দাঁড়ি গোঁফে আটকে থাকা ধুলোবালিমিশ্রিত রোগজীবাণু বিদূরিত হয়। শাহাদাত আঙুল দিয়ে দু'কানের ছিদ্র, বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে দু'কানের পেছন দিক এবং হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ করলে রোগ জীবাণু মিশ্রিত ধুলোবালি ওইসব অঙ্গ থেকে হয়ে যায়। সবশেষে দু'পা গিরা থেকে গোড়ালি ও পায়ের তলা, দু'পায়ের আঙুল, নখের কোনাসহ অতি যত্নসহকারে ধুয়ে অজু সম্পন্ন করতে হয়। একবার মাথা মাসেহ ব্যতীত সব অঙ্গ তিনবার ধৌত করা সুন্নত। শরীরের অনাবৃত যেইসব অঙ্গ অজুর আওতায় আনা হয়েছে দৈনিক পাঁচ

ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঁচবার অজু করার সময় তিনবার করে মোট ১৫বার ওই সমস্ত অঙ্গ ধোয়া হলে করোনাভাইরাসসহ সব ধরনের রোগ জীবাণু থেকে দেহ সুরক্ষিত থাকা খুবই সহজ। অজুর মাধ্যমে হাত-পা, চোখ-কান, নাক, মাথার পবিত্রতা অর্জনের সাথে সাথে মন-মস্তিষ্কের কলুষতা দূরীভূত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একধরনের নূরানি আভা ফুটে ওঠে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক সুপারিশকৃত ঘন ঘন হাত ধোয়া, মাস্ক পরার চেয়ে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত অজুর বিধান বহু গুণ ফলপ্রসূ ও বিজ্ঞানসম্মত। অজুর মাহাত্ম্য শুধু দুনিয়াতে নয়, আখিরাতেও আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পছন্দনীয় আমল হিসেবে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে একটি হাদিস উল্লেখ করা হলো : এক ব্যক্তি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হাশরের ময়দানে অগণিত মানুষের মধ্যে আপনি আপনার উম্মতকে চিনবেন কিভাবে? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অজুর বরকতে তাদের ললাট এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দীপ্তিময় হবে। অন্য কোনো উম্মতের এই বৈশিষ্ট্য নসিব হবে না। তাদের জন্য একটি আলামত হবে যে, আমলনামা তাদের ডান হাতে থাকবে। তাদের সম্মুখভাগে নূরের রোশনি পতিত হতে থাকবে।' আসুন, আমরা মহান আল্লাহ পাকের রহমতের আশা নিয়ে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে একাগ্রচিত্তে শুদ্ধভাবে অজু করি। আমিন।

লেখক: সাবেক সভাপতি, রেয়াজ উদ্দীন বাজার বণিক কল্যাণ সমিতি, চট্টগ্রাম।

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে হতাশার কুফল

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

আল কোরআনের সূরা ইউসুফ-৮৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।' সুরা যুমার ৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে- তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' সূরা আনকাবুতের ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে, তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে'। উপরোক্ত আয়াতসমূহে তাকে নিরাশ হবার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে হারিয়ে তার পিতা হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম অসহনীয় বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করেন। ভারাক্রান্ত অন্তরে তার অন্যান্য ছেলেদেরকে নসীহত করেন। তারা বেশ কয়েকবার তাদের পিতাকে মিথ্যা তথ্য দেয়ার পরেও তিনি সবর এখতিয়ার করেন। সবর এখতিয়ার করাকেই জীবনের সফলতা ও সৌন্দর্য হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিশেষে ছেলেদেরকেও সবর ও আশাবাদ শিক্ষা দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন। ফলে তিনি ও তার সন্তানাদি সকলকেই ফিরে পেয়েছেন। ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তার ভাইদের মাফ করে বলেছিলেন, "লা তাসরী-বা আলায়কুমুল ইয়াওম" আজকের দিনে তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নেই। আল্লাহ তায়ালা 'খাওফ' ও 'তামআ'- ভয় ও আশাবাদের মধ্যে থাকার আদশে দিয়েছেন। মুমিন একদিকে ভয় করবে অন্য দিকে আশা রাখবে। এভাবেই কাজ করে যাবে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য। হাদিস শরীফে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাসমূহ উল্লেখ আছে। বুখারী শরীফে হযরত বরা ইবনে আজেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসটি এখানে উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি। কারণ আগের বছরই মাত্র ৩১৩ জন সাহাবি তিন গুণের বেশি শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করে বিজয়ের বেশে অবস্থান করেছিলেন। বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সুনাম-সুখ্যাতি, বীরত্ব বেশ বৃদ্ধি ও প্রচারিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের বিজয়ের মূল ও প্রত্যক্ষ কারণ ছিলো নবী-ই আক্রামের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও বিশ্বাস। ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে ১৫০ জনের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে বললেন- যদি দেখ পাখি আমাদের গোশত ছিড়ে খাচ্ছে তবুও ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি দেখ আমরা শত্রু দলকে পদদলিত করছি তবুও ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না। যুদ্ধে কাফেররা পরাস্ত হল। আল্লাহর শপথ আমি দেখলাম কাফেরদের নারীগণ তাদের পরিধেয় বস্ত্র টেনে ধরে যুদ্ধের ময়দানে রুখে রাখতে চেয়েছিল। পেছনে গিরিপথে নিয়োজিত তীরান্দাজগণও হযরত আব্দুল্লাহর নিষেধ উপেক্ষা করে গণীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হলেন। ফলে তাঁরা কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীগণকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ কি তোমরা ভুলে গেছ? তারা গণীমতের মাল আহরণ করতে গেলে পরিস্থিতি ও যুদ্ধাবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। মুসলমানগণ পলায়নপর হয়ে পড়লেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন তার পিছনে ১২ জনের বেশি লোক ছিলোনা। মুসলমানদের ৭০ জন লোক শহীদ হলো, ৭০ জন কাফিরদের নিহত হল-ও ৭০ জন তাদের আহত হল। হাদিসের বর্ণনা থেকে পাওয়া গেল- সেনাপতির কথা না শোনার কারণে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেল। নেতৃত্বের আদেশ মানার মধ্যে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য যেভাবে আসে তা অন্য কোনো কিছুতে সে ভাবে আসে না। হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক সাহাবী শহীদ এবং অনেকে আহত হন, এমনকি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আহত হলেন। এ আহত হবার ঘটনা শোনার পর স্বাভাবিকভাবেই সকলেই ভেঙে পড়ার কথা। হতাশা আর দুঃখ বেদনা নিয়ে নতুন করে মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া চিন্তাও করা যায় না। অথচ কী ঘটল? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আহত, আরো অনেকে আহত। এমতাবস্থায় কাফের সৈন্যগণ যখন বিজয়ের পর মক্কার দিকে কিছুদূর ফেরত গেল তখনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য। সাহাবীদের মধ্যে যারা যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় তাঁরা শত্রুদের ধাওয়া করলেন। রসূলে পাকের আদেশ

পালন আর আখিরাতের চেতনা তাদের মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। যার ফলে এ বিপর্যস্ত অবস্থায়ও তাঁদেরকে হতাশা স্পর্শ করতে পারে নি। আখিরাতের চেতনায় হতাশা তাঁদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেননি। তাঁরা বিজয়ী হলে অহংকারী হতে পারেন না আর পরাজিত হলে হতাশ হতে পারেন না। আখিরাতের চেতনা যার দুর্বল অন্য কোন চেতনা সক্রিয় সে বিজয়ী হলে সীমা লংঘন করে অহংকারী হয়, আর পরাজিত হলে হতাশ হয়। তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে হতাশার প্রকাশ ঘটে।

কোন মুমিন ব্যক্তি যাতে কখনো হতাশ না হয় সে জন্য একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়ার জীবন ক্রমশই সরে যাচ্ছে এবং আখিরাতের জীবন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তোমরা দুনিয়ার সন্তান হয়োও না, তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। আজকের দিনে কাজ করার সুযোগ আছে হিসাবের ব্যবস্থা নেই; কিন্তু আগামীকাল শুধু হিসাব আর হিসাব থাকবে- কাজ করতে চাইলেও কাজ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। আখিরাতের এ চেতনা সাহাবীদের মধ্যে ছিল সক্রিয়। ফলে যে কোনো সময় যেকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাঁরা পিছপা হতেন না। হতাশা নামক শব্দটি তাদের অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। উহুদের যুদ্ধ হয় ১৫ই শাওয়াল, শনিবার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সেনাবাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধ এ তিনদিন অবস্থান করলেন- তারপর ফিরে আসলেন। এ সময় মদিনার তত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের উপর। ইবনে ইসহাকের মতে, উহুদ যুদ্ধ ছিল চরম পরীক্ষা ও মুসিবতের দিন। এ যুদ্ধে আল্লাহ মুমিন ও মুনাফিকদের ছাঁটাই বাছাই করেন। যারা মুখে ঈমানের দাবি করত কিন্তু মনে মনে গোপনে কুফুরীর ধ্যান-ধারণা পোষণ করতো তারা হতাশ হয়েছিল এবং তারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।

যারা কোন ভূখণ্ডে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করে তাদের জীবনে আশা ও হতাশা দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন ঈমানদার লড়াই করার মাধ্যমে তিনটি মৌলিক জিনিস ও একটি অতিরিক্ত জিনিস লাভ করে। মৌলিক তিনটি হলো জাহান্নামের আগুন থেকে বাচা, গুনাহ মাফ হওয়া ও জান্নাতের জন্যই সে জিহাদ করে। আরেকটি অতিরিক্ত জিনিস তার জন্য রয়েছে সেটি শর্ত সাপেক্ষ। সেটি হল নিকটবর্তী বিজয়। আর এর শর্ত হলো আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কখনো কোনো বিজয় আসতে পারে না। সূরা নছর এর এই আয়াতে আগে আল্লাহর সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, তারপর বিজয়ের কথা বলা হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের কাজে যারা জড়িত তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা, গুনাহ খাত্বা মাফ পাওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করার মূল লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

দুনিয়ার সুখ-সুবিধা কে আখিরাতের চেয়েও বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। সুরা নেসার ৭৪ নং আয়াতের " দুনিয়ার জীবনের সুখ সুবিধাকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করো" - হতাশা থেকে আশার আলো গ্রহণ করার জন্য যেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে তা হল-

এক. কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দুই. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-আদর্শকে বেশি করে জানতে হবে।

তিন. সাহাবীদের জীবনী বেশি বেশি অধ্যয়ন করে তা মনে রাখতে হবে।

চার. কাজ করলে সমালোচনার সময় থাকে না, আর সমালোচনা করলে কাজ হয় না- তাই বেশি বেশি কাজ করতে হবে ও জনশক্তি কে বেশি বেশি কাজ দিতে হবে।

পাঁচ. বিগত ভুল ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

ছয়. দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ বিষয়গুলোর মধ্যে গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

সাত. জড়তা ও হতাশা মুছে ফেলে দ্বীনি তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

আট. চোখের পানি ফেলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ করতে হবে, শেষ রাতের এবাদতের আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে।

উপরোক্ত কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়িত হলে আশা করা যায় হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত হলে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আখিরাতের চেতনা দিয়ে 'হতাশা' নামক কঠিন ব্যাধি থেকে নাজাত দিন। আমিন।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, সংগঠক

প্রবন্ধ

ভাস্কর্য ও মূর্তি স্থাপন : প্রেক্ষিত ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি

ভূমিকা

পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম ও মন্ত্র-তন্ত্রের মূলোৎপাঠন হয়ে চির নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের বিধান চির শাশ্বত ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনিত ধর্ম।'[৪১]

ইসলাম ধর্মের ঐশী গ্রন্থ কুরআনুল করিমে মানব জাতির প্রতিটি বিষয়ের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে ইহ-পরকালীন কোন বিষয় বাদ দেয়া হয়নি। তাইতো কুরআনুল করিমকে আল্লাহ তা'আলা তিবয়ান (সাবির্ক বর্ণনা জ্ঞাপক) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

'আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিমদের) জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।'[৪২]

চিত্রাংকন বা চিত্রকলা প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে চলমান একটি শিল্প। চিত্রাংকন সম্পর্কে ইসলাম ধর্মে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করা হয়েছে। চিত্রাংকন ইসলাম ধর্মে কতটুকু বৈধ বা অবৈধ কুরআন ও হাদিস, সাহাবা কিরামের উদ্ধৃতি এবং ইসলামী মনীষীগণের মতামতের আলোকে একটি স্বচ্ছ ধারণা আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

চিত্রাংকন বা চিত্রকলার মর্মার্থ

আরবিতে চিত্র'র প্রতিশব্দ হলো: صورة (সূরাতুন) আর অংকনের আরবি শব্দ হলো: تصوير (তাসভির)। এখন صورة (সূরাতুন) বিষয় নিয়ে কুর'আনুল করিম এবং রাসূলের হাদিসে কি হুকুম বা বিধান দেয়া হয়েছে, তা আলোচনা করার প্রয়াস পাব। অতীত কাল থেকে সাধারণত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চিত্রাংকন শিল্প প্রচলন আছে। যেমন: ১. প্রতিমা অংকন, ২. ভাস্কর্য অংকন এবং ৩. দৃশ্য (জীববিশিষ্ট ও জীববিহীন) অংকন। এসবের বিধান এক ও অভিন্ন নয়, বরং ইসলাম ধর্মে প্রতিটি বিষয়ের স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রতিমা অংকনে ইসলামের বিধান

প্রতিমা পূজা বা আরাধনা সরাসরি শিরক এবং কুফরি। তাছাড়া ইসলামে প্রতিমা নির্মাণ বা মূর্তির চিত্রাংকন সম্পূর্ণ হারাম। মূর্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি সকল বিষয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

'তোমরা অপবিত্র বস্তু তথা মূর্তিসমূহ পরিহার করো এবং পরিহার করো মিথ্যাকথন।'[৪৩]

উক্ত আয়াতে প্রতিমাকে 'রিজস' বলা হয়েছে। আর আরবিতে রিজস শব্দের অর্থ নোংরা ও অপবিত্র। প্রতিমার জন্য রিজস তথা অপবিত্র ব্যবহার করে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, মূর্তির সংশ্রব পরিহার করা পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচায়ক। ইমাম কুরতুবি বলেন, আরবরা ইবাদাত ও সম্মানার্থে কাঠ, লৌহা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য ইত্যাদি পদার্থ দিয়ে মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করতো। আর খ্রিষ্টানেরা ক্রুশ তৈরী করে ভাস্কর্য স্বরূপ দাঁড় করিয়ে রাখতো এবং ইচ্ছামতো পূজা করতো। তাই আয়াতে সব ধরণের প্রতিমা অংকন এবং নির্মাণ হতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৪]

হযরত নূহ আলাইহিসস্ সালাম নিজ সম্প্রদায়কে একত্ববাদের বিশ্বাসী করে তোলার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রায় সাড়ে নয়শত বছর যাবৎ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দ্বীনী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততম

[৪১]. আল্ কুরআন, সূরা আলি ইমরান ২ : ১৯।
[৪২]. আল্ কুরআন, সূরা নাহাল, আয়াত : ৮৯।
[৪৩]. আল্ কুর'আন, সূরা হাজ্জ, ২২: ৩০।
[৪৪]. কুরতুবি, আল্ জামি' লি আহকামিল কুর'আন, দ্বাদশ খ-, পৃ. ৫৪।

সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাদের কম সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তাদের সমাজপতিরা মৃত্যুবরণকারী পূণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতিমা তৈরী করে শিরকী কাজে লিপ্ত থাকতো। তাই পূণ্যবান ব্যক্তিদের ভাস্কর্য তৈরীর নিন্দা জ্ঞাপন করে তাদেরকে পূজা করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

'এবং তারা (সমাজপতিরা) বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে এবং কখনো পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুও'আ, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্‌রকে।[৪৫]

বিশিষ্ট সাহাবি হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের যুগে কিছু পূণ্যবান মহা মনীষীর মৃত্যু হলে শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো যে, তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে মূর্তি স্থাপন করা হোক এবং তাদের নামে সেগুলোকে নামকরণ করা হোক। সম্প্রদায়ের লোকেরা এমনই করলো। ওই প্রজন্ম যদিও তাদের পূজা করেনি কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূজায় লিপ্ত হলো। তাই উক্ত আয়াতে পূজার উদ্দেশ্য প্রতিমা তৈরী করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪৬]

কুর'আনুল করিমে মূর্তি ও প্রতিমাকে পথভ্রষ্টতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

'স্মরণ করুন, ইবরাহীম যখন বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দুরে রাখুন। আমার প্রতিপালক! এ সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।'[৪৭]

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম কা'বা শরিফ নির্মাণ করার পর আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজ সন্তান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় আয়াতে মূর্তিপূজার কুফল বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহর একত্ববাদ পরিহার করে শিরক তথা প্রতিমাপূজা মানুষকে অধিকহারে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। তাফসিরবিদ সমরকন্দি বলেন, শয়তান মানব জাতির পরম শত্রু। সে কস্মিনকালেও মানবজাতির শুভ কামনা করেনা। শয়তান পাথর বা জড় পদার্থ নির্মিত প্রতিমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পূজারীদের মন দারুণভাবে আকৃষ্ট করে; যদ্দরুণ তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে যায়। তাই আয়াতে কারিমায় বিভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সরাসরি প্রতিমাগুলোর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৪৮] অতএব কুরআনুল কারিমে একটি বস্তুকে ভ্রষ্টতার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করার পর তা মনের কোঠায় এনে কল্পনা করা এবং তা অতি ভক্তি নিয়ে অংকন করা ইসলামি শারি'আতে কখানো গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হতে পারেনা। এভাবে অপর আয়াতে মুর্তিপূজাকে সকল মিথ্যা ও উদ্ভবের উৎস বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا

'তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।'

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, মুশরিকরা ইবাদাত ও আরাধনার নিমিত্তে নিখুঁত তুলি দিয়ে ইচ্ছামতো দেব-দেবীর আকৃতি অংকন করে লোকজন সমবেত করত। এতে তাদের নির্মাণকৃত প্রতিমাগুলো নিজেদের ইলাহ বা উপাস্য নির্ধারণ করত। মূলত এটি তাদের মিথ্যা দাবি। তাই আয়াতে কারিমায় প্রমাণিত হয়, মূর্তি নির্মাণ এবং দেব-দেবীর সূরত অংকনই সকল অবান্তর ও উদ্ভবের মূল উৎস।

অতএব, উপরে বর্ণিত কুর'আনুল করিমের আয়াতে প্রতীয়মাণ হয়, মূর্তি ও প্রতিমাপূজা শিরক ও নিষিদ্ধ, সুতরাং ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা ভক্তির উদ্দেশ্যে হোক বা চিত্রকর্মে বা নির্মাণ করা পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে হোক তা অংকন ও চিত্রকরা ইসলামি শারি'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, গর্হিত এবং নিন্দনীয়।

চিত্রাংকনে আল হাদিসের দিক-নির্দেশনা

আল্ হাদিস ইসলামি শারি'আতের দ্বিতীয় দলিল। কুরআনুল কারিমে সংক্ষেপ বিষয়টিকে বিস্তারিত ও স্পষ্ট করা হয়েছে রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরিফে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু

[৪৫]. আল্ কুর'আন, সূরা নূহ ৭১ : ২৩।
[৪৬]. ইমাম বুখারি, আস্ সাহিহ, তাফসির অধ্যায়, হাদিস নং. ৪৯২০।
[৪৭]. আল কুরআন, সূরা ইবরাহিম ১৪: ৩৫-৫৬এ
[৪৮]. আবুল লায়স নাসর ইবন মুহাম্মদ আস্ সামারকান্দি (মৃ. ৩৭৩ হি.), তাফসির বাহরুল 'উলূম, ২য় খ-, পৃ. ২৪৫।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা, কর্ম এবং মৌনসম্মতিই হাদিস; যা অহি তথা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

'তিনি মনগড়া কথা বলেননি। যা বলতেন তা প্রত্যাদেশই মাত্র।'[৪৯]

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য হাদিস দ্বারা মূর্তি তৈরী করা কিংবা মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল্ কুশাইরি রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আমার ইবনে আবাসা আস্ সুলামি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ،

'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, প্রতিমাসমূহ ভেঙ্গে ফেলার এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন বস্তুকে অংশীদার না করার বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন।'[৫০]

প্রতিমার ছবি ও আকৃতি যেহেতু শির্ক ও বাতুলতার দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে অনীহা সৃষ্টি করে তাই তা সমূলে বিনাশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

কোন কর্মের ফলে যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে তাহলে তা অবশ্যই গর্হিত, নিষিদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিকৃতি এবং প্রতিমা অংকনকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

'কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি যাদের হবে তারা হলো প্রতিকৃতি তৈরিকারী (চিত্রকর ও মুর্তিগর)।'[৫১]

প্রতিকৃতিকারী এবং চিত্রকর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণবাচক নাম; যাকে আরবিত আল্ মুসাব্বির (الْمُصَوِّرُ) বলে। তাই আল্লাহ ছাড়া যেহেতু কারো প্রাণীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার সম্ভব নয়, তাই কোন মানুষের উচিত নয় এমনি প্রতিকৃতি ও চিত্র তৈরী করা। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক চিত্রকরকে বলা হবে তার চিত্রিত মূর্তিতে প্রাণ সৃষ্টি করতে; অথচ সে অপারগ হয়ে সেদিন সত্যিই লজ্জিত হবে।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

এ প্রতিকৃতি নির্মাতাদের তথা চিত্রকরদের কিয়ামত দিবসে শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে এ বলে সম্বোধন করা হবে, 'যা তোমরা তৈরি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার কর।'[৫২] প্রখ্যাত হাদিসবিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার আল্ 'আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, চিত্রকরদের চিত্রকর্ম ও চিত্রশিল্পী সর্বদা পরিত্যাজ্য, কারণ তারা সবসময় হারাম তথা নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তির পেশা ও কাজ পূজার মতো শিরক কাজ করা, তার পরিণামতো অত্যন্ত ভয়াবহ হবেই। তাছাড়া, যে ব্যক্তি স্রষ্টার সামঞ্জস্য গ্রহণের মানসিকতা পোষণ করে সে নিঃসন্দেহে কাফির।[৫৩]

শুধু তা নয়, প্রতিকৃতি নির্মাণকারী আল্লাহ তা'আলার পরম শত্রু ও যালিম হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ তা'আলার সমপর্যায়ের আসনে যে আসীন করছে এতটুকু উপলব্ধিও তার হয় না, বরং সে ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে চলে যায়। হযরত আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণিত হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً

'ঐ লোকের চেয়ে বড় অত্যচারী কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে? তাদের যদি সামর্থ থাকে তবে তারা একটি কণা, একটি শষ্য কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক।'[৫৪]

এভাবে মুর্তি প্রস্তুতকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত অবধারিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহর লা'নত

---

[৪৯]. আল্ কুর'আন, সূরাহ্ নাজম ৫৩: ২-৩এ

[৫০]. ইমাম মুসলিম, আস্ সাহিহ, ১ম খ-, প,৫৬৯, হাদিস নং. ৪৩২।

[৫১]. ইমাম বুখারি, আস্ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৯৫০।

[৫২]. ইমাম বুখারি, আস্ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৯৫১।

[৫৩]. ইবন হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি, ১০ম খ-, পৃ. ৩৯৭।

[৫৪]. ইমাম বুখারি, আস্ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৯৫৩।

তথা অভিসম্পাতকৃত ব্যক্তিরা অনেক সময় কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالمُصَوِّرَ

'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ প্রদানকারী, উল্কি অংকনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদের (চিত্রকরদের) উপর অভিসম্পাত করেছেন।'[৫৫]

মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ ও ভক্তির উদ্দেশ্যে তার কবরে কিংবা যে কোন স্থানে ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি স্থাপন করা ইসলামি শারিআতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানেরা তাদের পদস্থ ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্মরণ করার জন্য এমন নীতি গ্রহণ করে থাকে; যা তাদের চলমান সনাতন সংস্কৃতি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আ'য়িশাহ্ সিদ্দিকাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদিসে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুঠে উঠে। যেমন :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'উম্মুল ম'মিনীন হযরত আ'য়িশা সিদ্দিক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে হযরত উম্মে হাবিবাহ ও উম্মে সালামাহ্ একটি গির্জার (মারিয়া গির্জা) কথা উল্লেখ করলেন। (তারা উভয়ে ইতোপূর্বে হাবশায় গিয়েছিলেন) গির্জাটির কারুকার্য ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা তারা নবীজীর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয্যা হতে মাথা মোবাকর উত্তোলন করে বললেন, ওই জাতির পূণ্যবান লোক যখন মারা যেত, তখন তারা তার কবরের উপর ইবাদাতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে এরাই (প্রতিকৃতি স্থাপনকারীরা) হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[৫৬]

প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা বা উন্মুক্ত রাখার বিধান

যে কোন প্রাণীর ছবি ঘরের দেয়াল কিংবা ছাদে ঝুলিয়ে রাখা হাদিস শরিফে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদিসবিশারদের দৃষ্টিতে প্রাণী বলতে সাধারণত মানুষ সহ সব ধরণের স্থলজ ও জলজ প্রাণীই বুঝায়। এ সকল ঘরে বা আবাসস্থলে রাহমাত ও শান্তির ফিরিশতা প্রবেশ করেননা। ফিরিশতাদের প্রবেশ না করার মূল কারণই হল বস্তুটি তাদের কাছে ঘৃণিত ও নিন্দিত হওয়া। কারণ, ইসলামি শারিআতে অনুমোদিত আমল ও কর্ম হলো ফিরিশতাদের কাছে প্রিয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় বিশুদ্ধ হাদিস পাঠক সমীপে পেশ করা হলো :

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

'হযরত আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, কুকুর ও প্রাণীর ছবি যে ঘরে বিদ্যমান থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেননা।[৫৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ

'হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঘরে কোন প্রতিকৃতি কিংবা ছবি থাকে, তাতে ফিরিশতা প্রবেশ করেননা।'

[ইমাম মুসলিম, আস্ সাহিহ, হাদিস নং ২১১২।]

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ.

'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঘরে কুকুর এবং কোন প্রতিকৃতির ছবি থাকবে, তাতে ফিরিশতা প্রবেশ করেননা।'

[ইমাম তিরমিযি, আস্ সুনান, হাদিস নং ২৮০৪]

প্রাণীর ছবিযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান কিংবা ব্যবহারে শারিআতের বিধান

প্রাণীর ছবিযুক্ত পোষাক পরিধান করা সর্ব সাধারণ মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। এ সব কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা শারিআতে নিষিদ্ধ। প্রাণীর ছবি, এবং

[৫৫]. পূর্বোক্ত, হাদিস নাম্বার, ৫৯৬২।

[৫৬]. ইমাম মুসলিম, আস্ সাহিহ, হাদিস নং ৫২৮।

[৫৭]. ইমাম মুসলিম, আস্ সাহিহ, হাদিস নং ২১০৬।

মূর্তি ও প্রতিকৃতি সম্বলিত কাপড় পরিধান করা, এসব ছবি সম্বলিত চাদর বিছিয়ে নামায আদায় করা কিংবা কক্ষে বা ঘরের চতুর্দিকে প্রাণী, ভাস্কর্য এবং মূর্তির ছবি বাঁধানো কিংবা ঝুলন্ত থাকাবস্থায় নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরিমি বা নিষিদ্ধ। [ইমাম কাসানি, বাদাঈ'য়ুস্ সানা'ঈ, ১ম খ-, পৃ. ১১৬]

হানাফি মাযহাবের প্রাজ্ঞ ফিকহবিদ ইমাম কাসানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন:

رُوِيَ أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ خُيُولٍ وَرِجَالٍ؟

'বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে অনুমতি চাইলেন। নবিজি তাঁকে কাছে আসতে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কিভাবে ঐ ঘরে প্রবেশ করবো, যে ঘরের পর্দায় ঘোড়া এবং মানুষের ছবি থাকে? [পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।]

তবে অতীব ক্ষুদ্র, মাথাবিচ্ছিন্ন এবং অস্পষ্ট ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতে দূষণীয় নয় বলে ফোকহা কিরাম মত প্রদান করেছেন। কিন্তু ছবি ছাড়া স্বচ্ছ কাপড় থাকলে উপরোক্ত কাপড় পরিধান এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। [পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬]

ড্রয়িং ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

আমাদের দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন এবং শিশু নিকেতনসহ সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক হিসাবে ড্রয়িং বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত করা হয়। এমনকি কিছু কিছু মাদরাসার ইবতেদায়ী স্তরে এটিকে গুরুত্বসহকারে পাঠ্য তালিকায় আনা হয়। শিক্ষার্থীদের চিত্রলিপিতে পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক এবং বাৎসরিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব ও পুরস্কার লাভের প্রয়াসে অভিভাবকগণও নিজ সন্তান-সন্ততিদের প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে। এ সকল ড্রয়িং এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অবশই ব্যক্তি ও প্রাণীর ছবি অংকন বিষয়টি এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ, মুসলিম কচি শিক্ষার্থীরা যদি ব্যক্তি বা ছবি অংকন করতে অভ্যস্থ হয়, তাহলে তারা পরবর্তীতে ইসলাম বিরোধী মনোভাব ও চিন্তাধারার দিকে ধাবিত হবে। তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রাণীর ছবি অংকন বিষয়টি সিলেবাস থেকে বাদ দিতে হবে এবং এর পরিবর্তে কা'বা শরীফ ও মদিনাহ্ শরিফের দৃশ্যসহ প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন বিষয়টি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আধুনিকতার বশবর্তী হয়ে ইসলামি শারি'আতের বিধি-বিধান লংঘন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান- আল্ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

বিশ্ব মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের প্রিয়নবী

সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী

জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান-সাধনা মানুষের প্রবৃত্তি। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা এবং অজয়কে জয় করা মানুষের সহজাত গুণ। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষক এবং শিক্ষা শব্দ দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষকের মাধ্যমেই শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটে থাকে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ডহীন মানুষ যেমন দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষাবিহীন কোনো জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যেসব গুণাবলি ও প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে।

আর শিক্ষকতাও একটি মহান পেশা। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। একজন ছাত্রকে কেবল শিক্ষিতই নয়, বরং ভালো মানুষ করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বটাও থাকে শিক্ষকের ওপরই। তাই একটি সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে মানব জাতির শিক্ষকরূপে সম্মানিত নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেন।প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সব নবীই ছিলেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত এবং সু-শিক্ষার ধারক ও বাহক। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সে ধারার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানদক্ষতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষকরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি একটা উল্লেখযোগ্য সময় শিক্ষকতায় ব্যয় করতেন। সে জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ পৃথিবীতে রাষ্ট্র প্রধান বা সেনাপতি কোন নামেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেননি। বরং তিনি নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে এভাবে গর্ববোধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: إنّما بُعِثْت معلّماً 'আমি মানবতার জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।'[৫৮]

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'হে মানুষেরা! আমি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছি। যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কোরআন) পাঠ করে শোনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে,তোমাদের কিতাব ও হিকমত (কোরআন ও বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যে বিষয়ে কিছুই জানতে না, সেটা শিক্ষা দেয়। [বাক্বারা : ১৫১]

তাঁর মাধ্যমে ঐশী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি তাঁর কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের মূর্খ ও বর্বর একটি জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান এবং ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন একজন পরিপূর্ণ আদর্শ শিক্ষক। যার প্রতিটি কথা, কাজকর্ম ইত্যাদিতে ছিল কেবলই শিক্ষা। তাই তো তিনি হলেন উভয় জগতের আদর্শ শিক্ষক। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ জ্ঞানের ভান্ডার আল কুরআনের ধারক-বাহক। অজ্ঞতা-অশান্তির চরম সময়ে শিক্ষার মশাল নিয়ে এসেছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর জ্ঞানের মশাল জ্বলে উঠেছিল শত দীপশিখায়, ছড়িয়ে পড়েছিল দিগন্তে। তাঁর আবির্ভাবে এবং কুরআনের চির নির্ভুল সত্যবাণী অবতীর্ণ হওয়ার ফলে অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকার কেটে গেল। বিশ্বমানবতা লাভ করল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন।

---

৫৮ -সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৯

আর কেনোই বা তিনি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হবেন না, যখন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাঁকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আমাকে তিনি সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন সুতরাং তিনি সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছেন।[৫৯]

আল্লাহ্পাক রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় করিয়ে দিয়ে কোরআনুল কারিমে বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

'তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা। যিনি উম্মী লোকদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। যদিও ইতোপূর্বে তারা ভ্রান্তিতে (অজ্ঞতায়) মগ্ন ছিলো।' [সূরা জুমা : ০২]

মূলত তাঁর শিক্ষা ছিল নিখুঁত। তাঁর ব্যবহার ছিল নমনীয় এবং আচরণ ছিল উদার ও ভালোবাসাপূর্ণ। মহান আল্লাহই তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বানিয়েছেন, তাঁর শিক্ষাকে মানুষ অতি সহজেই গ্রহণ করতে বাধ্য হতো এবং তাঁর পদতলে এসে আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হতো। তাঁর শিক্ষা পেয়ে আরবের অসভ্য সমাজে যে বিপ্লব ঘটেছিলো, এর আগে বা পরের কোনো শিক্ষক বা আন্দোলনের নেতা দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। সামাজিকতা, শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি, যুদ্ধনীতিসহ সব দিক থেকে তাঁর ছাত্ররা ছিলো অগ্রসর।

মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জন্মগতভাবেই শিক্ষকসুলভ আচরণ দান করেছিলেন। তাঁর অনুপম শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবি ও শিষ্যগণ। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন,

فَبِأَبِي هو وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللهِ، ما كَهَرَنِي ولا ضَرَبَنِي ولا شَتَمَنِي،

'তাঁর জন্য আমার বাবা ও মা উৎসর্গিত হোক। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো কঠোরতা করেননি, কখনো প্রহার করেননি, কখনো গালমন্দ করেননি।[৬০]

তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসৃত কয়েকটি শিক্ষাপদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

তিনি ছিলেন শিক্ষার্থীদের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহশীল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ছাত্রদের প্রতি ছিলেন পিতার ন্যায় স্নেহশীল। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ

আমি হচ্ছি তোমাদের সামনে পুত্রের জন্য পিতার ন্যায়। তাই আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিই।[৬১]

তিনি ছাত্রের আকল ও বিবেকের প্রতি খেয়াল রাখতেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের বুঝ ও আকলের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন এবং সে অনুযায়ী তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। তিনি ছোট-বড় সকলের মন-মেজাজের প্রতি সদা সতর্ক থাকতেন। প্রত্যেক মানুষকে তার আক্বল ও বিবেকানুযায়ী সম্বোধন করতেন।

তিনি ছাত্রদের মেধাশক্তি বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন

তিনি ছাত্রদের মধ্যে জানার কৌতূহল জাগাতেন, তাই তাদের সামনে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ওঠাতেন এবং তাদের থেকে উত্তর জানতে চাইতেন। যেনো তারা প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়। কেননা নিত্যনতুন প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে নিত্যনতুন জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহী করে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন,

---

৫৯- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أدَّبني ربي فأحسن تأديبي» جاء بعده روايات ذكرها العسكري في كتابه " الأمثال " والسرقسطى في كتابه "الدلائل " والسيوطي في كتابه " الجامع الصغير " وابن السمعاني في " أدب الإملاء " وأبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان

৬০ --সহিহ মুসলিম-৫৩৭

৬১ -(সুনানে তিরমিজি-০৮)

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا[৬২]

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে প্রশ্ন করলেন, একটা গাছ আছে, যার বরকত মুসলমানের ন্যায়। যে গাছের পাতা কখনো শুকায় না এবং ঝরেও পড়ে না। সর্বদা ফল দেয়। তোমরা বলো তো ওই গাছ কোনটি? তখন প্রত্যেকে বিভিন্ন উত্তর দেয়া শুরু করলো। ইবনে ওমর বলেন, আমার মনে হচ্ছিলো ওই গাছ হচ্ছে খেজুর গাছ। তাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানে অনেক বয়স্ক লোকও ছিলো। আর আমি ছিলাম বাচ্চা'। সর্বশেষ ইবনে ওমরের ধারণাই সঠিক হলো। কেউ বলতে না পারায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলে দিলেন সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ'।[৬৩]

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كنتُ ردفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على حِمارٍ، فقال: يا مُعاذُ، فقُلتُ: لبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: أتَدري ما حَقُّ اللهِ على العِبادِ؟ قال: قُلتُ: اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: فإنَّ حَقَّ اللهِ على العِبادِ أنْ يَعبُدوه ولا يُشركوا به شيئًا، فهل تَدري ما حَقُّ العِبادِ على اللهِ إذا فَعَلوا ذلك؟ قال: قُلتُ: اللهُ ورسولُه أعلمُ، قال: فإنَّ حَقَّ العِبادِ على اللهِ إذا فَعَلوا ذلك ألَّا يُعذِّبَهم. [৬৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, হে মুয়ায! তুমি কী জানো বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তার ইবাদত করা এবং তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করা।' [৬৫]

তিনি শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দিতেন

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এসব প্রশ্নের সমাধান না পেলে অনেক সময় পুরো বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। সে পাঠের পাঠোদ্ধার করতে পারে না। আর প্রশ্নের উত্তর দিলে বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে আরো আগ্রহী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ করতেন এবং প্রশ্ন করার জন্য কখনো কখনো প্রশ্নকারীর প্রসংশাও করতেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত।

أنَّ أعْرابيًّا عَرَضَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في سَفَرٍ، فأخَذَ بخِطامِ ناقَتِهِ، أوْ بزِمامِها، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللهِ -أوْ يا مُحَمَّدُ- أخْبِرْنِي بما يُقَرِّبُنِي مِنَ الجَنَّةِ، وما يُباعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قالَ: فَكَفَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ نَظَرَ في أصْحابِهِ، ثُمَّ قالَ: لَقَدْ وُفِّقَ، أوْ لَقَدْ هُدِيَ

'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নিবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থামলেন এবং তাঁর সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতপর বললেন, তাকে তওফিক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। [৬৬]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্নটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি। বরং তিনি চুপ থাকেন এবং সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রশ্নকারীর প্রশংসা করেন। যাতে প্রশ্নটির ব্যাপারে সকলের মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সকলেই উপকৃত হতে পারে।

তিনি কিছু প্রশ্নের জবাব শিক্ষার্জনকারীদের ওপর ছেড়ে দিতেন

তিনি নিজে সব ক'টির উত্তর দিতেন না। কোনো কোনোটির উত্তর দেয়ার দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর ছেড়ে

৬২- صحيح البخاري كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا حديث رقم ৬১ .شرح النووي على مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب مثل المؤمن مثل النخلة2811

৬৩ -(সহিহ বুখারি-২৮১১)

৬৪- أخرجه البخاري (২৮৫৬)، ومسلم (৩০)، والترمذي (২৬৪৩)، وابن ماجه (৪২৯৬) باختلاف يسير، وأبو داود (২৫৫৯) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (২২০৫৮) واللفظ له

৬৫ --সহিহ বোখারি : ৭৩৭৩

৬৬ -সহিহ মুসলিম : ৪২৯৯

দিতেন। যাতে তাদেরকে দিয়ে বিষয়টির অনুশীলন করানো যায়। যেমন এক সাহাবি এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। সেখানে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু উপস্থিত ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু উত্তর দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। ব্যাখ্যা দেয়ার পর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাখ্যা ঠিক হয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিছু ঠিক হয়েছে আর কিছু ভুল'।[৬৭]

তিনি সফলদের প্রশংসা করতেন

তিনি সাহাবাদের মেধা ও জ্ঞান যাচাই করার জন্য কোনো একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিতেন। সঠিক উত্তরদাতার সম্মাননা স্বরূপ তিনি প্রশংসা করতেন, বুকে হাত মেরে 'শাবাশ!' বলতেন। যেমন

يا أبا المُنْذِر، أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ. قالَ: يا أبا المُنْذِر أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟ قالَ: قُلتُ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هو الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة:٢٥٥] قالَ: فضَرَبَ في صَدْرِي، وقالَ: واللَّهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أبا المُنْذِرِ.

হযরত উবাই ইবনে কা'বকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, আল কোরআনে কোন আয়াতটি সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ? প্রথমে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন 'আয়াতুল কুরসি'। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বুকে হাত রেখে বলেন, 'শাবাশ!'। আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য ইলম অর্জন সহজ করুন।'[৬৮]

তিনি কখনো কখনো রাগ করতেন

তিনি যেমন স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন তেমনি তিনি প্রয়োজনে মৃদ প্রতি রাগও দেখাতেন। যেমন,

একবার তিনি বের হয়ে দেখেন সাহাবারা তাকদির নিয়ে তর্ক করছেন। তখন তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমাদেরকে এজন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে?[৬৯]

একজন আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব হল, ছাত্রদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার পাশাপাশি তাদেরকে আদব শিখানোর জন্য কখনও কখনও রাগ করা।

তিনি উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচন করতেন

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য। কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষক উভয়ের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষা করতেন। অর্থাৎ শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের সুযোগ দিতেন। অতপর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষাদান শুরু করতেন। হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত।

قالَ لي رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

'নিশ্চয় বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, মানুষকে চুপ করতে বল। অতপর তিনি বলেন, আমার পর তোমরা কুফরিতে ফিরে যেয়ো না...।'[৭০]

তিনি থেমে থেমে পাঠদান করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেনো তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। খুব দ্রুত কথা বলতেন না যেনো শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এতো ধীরেও বলতেন না যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠ দান করতেন। হযরত আবু বাকরাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

৬৭ -(সহিহ বুখারি-৬৬৭৫)।

৬৮ -(সহিহ মুসলিম-৮১০, ২০৬১)

৬৯- خرجَ علينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ نتَنازعُ في القَدرِ فغَضِبَ حتَّى احمرَّ وجهُهُ ، حتَّى كأنَّما فُقِئَ في وجنتيهِ الرُّمَّانُ ، فقالَ : أبِهَذا أُمِرتُمْ أم بِهَذا أُرسلتُ إليكم إنَّما هلكَ من كانَ قبلَكُم حينَ تَنازعوا في هذا الأمرِ ، عزَمتُ عليكم ألَّا تتَنازَعوا فيهِ(أخرجه الترمذي (٢١٣٣) واللفظ له والبزار (١٠٠٦٣)، وأبو يعلى (٦٠٤٥)

৭০ --সহিহ বোখারি : ৭০৮০

خَطَبَنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ النَّحْرِ، قالَ: أَتَدْرُونَ أيُّ يَومٍ هذا؟، قُلْنَا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّه سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ: أليسَ يَومَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قالَ: أيُّ شَهْرٍ هذا؟، قُلْنَا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّه سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، فَقالَ أليسَ ذُو الحَجَّةِ؟، قُلْنَا: بَلَى، قالَ أيُّ بَلَدٍ هذا؟ قُلْنَا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّه سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ، قالَ أليسَتْ بالبَلْدَةِ الحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قالَ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، إلى يَومِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألَا هلْ بَلَّغْتُ؟، قالوا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِن سَامِعٍ، فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (৭১)

'তোমরা কী জানো- আজ কোন দিন? ...এটি কোন মাস? ...এটি কী জিলহজ নয়? ...এটি কোন শহর?'(৭২) -

প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকেন এবং সাহাবারা উত্তর দেন আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন।

তিনি দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠ দান করতেন

তিনি কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে, তাঁর দেহাবয়বেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হতো। তিনি দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠ দান করতেন। কারণ,এতে বিষয়ের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রোতা শিক্ষার্থীগণ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হয় এবং বিষয়টি তার অন্তরে গেঁথে যায়। যেমন, তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তাঁর দেহ মুবারকে আনন্দের স্ফূরণ দেখা যেতো। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারা মুবারকের রঙ বদলে যেতো। যখন কোনো অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে বলতেন, তাঁর চেহারায় ক্রোধ প্রকাশ পেতো এবং কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেতো।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ " صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ "(৭৩)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বক্তব্য দিতেন- তাঁর চোখ মুবারক লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো। যেনো তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।' (৭৪)

তিনি গল্প বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতেন

শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে অনেক সময় গল্প-ইতিহাস বলতে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পাঠদানের সময় গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন অত্যন্ত মিষ্টি করে। এমন মিষ্টি ভঙ্গি গল্প-ইতিহাস স্বপ্রাণ হয়ে উঠতো। জীবন্ত হয়ে উঠতো শ্রোতা-শিক্ষার্থীর সামনে। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'দোলনায় কথা বলেছে তিনজন। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ...। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমি (মুগ্ধ হয়ে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আমাকে শিশুদের কাজ সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি তার মুখে আঙুল রাখলেন। এবং তাতে চুমু খেলেন।'(৭৫) অর্থাৎ তিনি শিশুদের মতো ঠোঁট গোল করে তাতে আঙুল ঠেকালেন।

তিনি আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ করতেন

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী শ্রেণী কক্ষে অনেক বেশি মনোযোগী হয়। একাগ্র হয়ে শিক্ষকের আলোচনা শোনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন।

عن أبي سعيد رافع بن المعلى -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ أعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ؟ قالَ: ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ

হযরত সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 'মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি

৭১- أخرجه البخاري (৪৪০৬)، ومسلم (১৬৭৯) صحيح البخاري كتاب الحج باب الخطبة أيام منى حديث رقم ১৬৬৭

৭২ -সহিহ বোখারি : ১৭৪১

৭৩- صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ حديث رقم ১৪৯৩

৭৪ --সহিহ মুসলিম : ১৪৯৩

৭৫ --মুসনাদে আহমদ : ৮০৭১

তোমাদেরকে কোরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছে করলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কোরআনে সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেবো। অতপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।' (৭৬)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সূরা ফাতেহা শিক্ষা দেন।

তিনি শিক্ষার্থী চয়ন করে নিতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। যেনো শেখানো বিষয়টি দ্রুত ও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে এবং তার ওপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন। (৭৭)

তিনি উদহারণ ও উপমা পেশ করতেন

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। কেননা উপমা ও উদাহরণ দিলে যে কোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়ে যায়।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(৭৮)

হযরত সাহাল ইবনে সাদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো। হযরত সাহাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদত ও মধ্যমা আঙুল মুবারকের প্রতি ইঙ্গিত করেন।'(৭৯)

তিনি প্রাক্টিক্যাল বা প্রয়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো প্রাক্টিক্যাল বা প্রয়োগিক শিক্ষা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ বিষয় নিজে আমল করে সাহাবিদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে-কলমে। এজন্য হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা বলেন, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي(৮০)

'তোমরা নামায আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো।' (৮১)

তিনি বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন

মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি সহজ উপায় হলো- মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষাদান করতেন। যেমন-

এক যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খেদমতে আরয করলো। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা মারমুখি হয়ে উঠলো এবং তিরস্কার করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কী তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ কর? সে বললো, আল্লাহর শপথ না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করে না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে একে তার সব নিকট নারী আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে না উত্তর দেয়। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন।(৮২)

তিনি চিত্র অংকনের সাহায্যে শিক্ষা দিতেন

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখা ও চিত্র অঙ্কনের

৭৬--সহিহ বোখারি : ৪৪৭৪

৭৭--মুসনাদে আহমদ : ৮০৯৫

৭৮- تحفة الأحوذي » كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته

৭৯--সহিহ বোখারি : ৬০০৫

৮০- صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام حديث رقم ৬৮৫৭

৮১--সুনানে বায়হাকি : ৩৬৭২

৮২--মুসনাদে আহমদ : ২২২১১

সাহায্য নিতেন। যেনো শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চারকোণা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন। যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা।' [৮৩]

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখাচিত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন ও জীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয় স্পষ্ট করে তুললেন।

বার বার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে সহজ করে উপস্থাপন করতেন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর না করে বার বার পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন; বরং বার বার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে আয়ত্ব করতে বলতেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ ، مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا[৮৪]

'তোমরা কোরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে। [৮৫]

তিনি আশা ও ভীতি জাগানোর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতেন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের অনাগত জীবন সম্পর্কে যেমন আশাবাদী করে তুলতেন, তেমনি তার চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। যেমন, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ দিলেন। আমি এমন ভাষণ আর শুনিনি। তিনি এরশাদ করেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।'[৮৬]

হযরত আবু যর গিফারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললো এবং তার ওপর মৃত্যুবরণ করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে।' [৮৭]

তিনি জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ করে তুলতেন মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বহু জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ হয়ে যায় এবং উত্তম সমাধান পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বহু বিষয় মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। সমাধান বের করতেন। যেমন, হুনায়নের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। [৮৮]

গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি করতেন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিন বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভালোভাবে বোঝা যায়।'[৮৯]

৮৩--সহিহ বোখারি : ৬৪১৭

৮৪- البخاري في صحيحه - باب استذكار القرآن وتعاهده - حديث رقم ৪৭৬৩ .صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا ، حديث رقم ১৩৬৬

৮৫ -সহিহ বোখারি : ৫০৩৩

৮৬--সহিহ বোখারি : ৪৬২১

৮৭--সহিহ বোখারি : ৫৪২৭

৮৮--সহিহ বোখারি ও মুসলিম

৮৯ - -শামায়েলে তিরমিজি : ২২২

ভুল সংশোধন করে দিতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন।

হযরত আবু মাসউদ আনসারি রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি নামায দীর্ঘায়িত করে ফেলে। আমি উপদেশ বক্তৃতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সেদিনের তুলনায় আর কোনোদিন বেশি রাগ হতে দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমরা অনীহা সৃষ্টিকারী। সুতরাং যে মানুষ নিয়ে (জামাতে) নামায আদায় করবে, সে তা যেনো হাল্কা করে (দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ্য, দুর্বল ও যুল-হাজাহ (ব্যস্ত) মানুষ রয়েছে।

১--সহিহ বোখারি : ৯০

তিনি শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন করতেন

গুরুতর অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তাঁর শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে সংশোধন করতেন। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় শারীরিক শাস্তি এড়িয়ে যেতেন। ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় হযরত কাব ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুসহ কয়েকজনের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলা বন্ধ করে দেন। যা শারীরিক শাস্তির তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতির সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে যদি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হয় এবং উভয় জগতের সাফল্য অর্জন করতে হয়, তবে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক,
সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

তরজুমানে আহলে সুন্নাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফী সাধকদের অবদান

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

হযরত শাহ্ খাজা শরফুদ্দীন চিশতি

[চীন সমুদ্রগামী আরব বাণিজ্য নৌবহরে যাওয়ার পথে কোনো কোনো সাহাবী বাংলা বন্দরে যাত্রা বিরতি করে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ দেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য ইসলাম প্রচারক আউলিয়াদের কয়েকজনের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হল। ভবিষ্যতে অনেকের পরিচয় জানানোর ইচ্ছা রইলো।]

শরফ হযরত খাজা শরফুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ২য় স্ত্রী হযরত বিবি ইসমতের গর্ভে ৬২৮ হিজরী মোতাবেক ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের আজমীর শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত 'ফাওয়াইদুল ফুয়াদ' এবং তাঁর খলীফা হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত 'খায়রুল মজ্জিল' পুস্তকের বর্ণনায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ওলী-এ-বাংলার (খাজা শরফুদ্দীন চিশতী) প্রকৃত নাম ছিল খাজা হুসাম উদ্দীন আবু সালেহ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা হযরত খাজা ফখর উদ্দীন আবুল খায়ের চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র প্রথম স্ত্রী বিবি আমাতুল্লাহ্'র গর্ভজাত এবং ওই একই মাতার গর্ভে তাঁর একমাত্র বোন হযরত হাফেজা জামাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত গিয়াস উদ্দীন আবু সাইয়্যেদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর গর্ভধারিণী মাতা বিবি ইসমতের গর্ভজাত ছিলেন। পিতৃকুলে এই ওলী সাইয়্যেদ ছিলেন এবং বংশধারা পিতা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মাধ্যমে রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার রক্তধারার সাথে সংমিশ্রিত ছিল। ওলী-এ বাংলার পাঁচ বছর বয়সে ৬ রজব ৬৩৩ হিজরী ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা গরীবে নেওয়াজকে হারান। ফলে সে সময়ে জৈষ্ঠ্যভ্রাতা হযরত ফখর উদ্দীন আবুল খায়ের চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির পরিচর্যায় তিনি লালিত-পালিত হন। পরে তিনি দিল্লীতে হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর হাতে বাইয়াত হন। ৬৩৩ হিজরী ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা হযরত খাজা ফখর উদ্দীন আবুল খায়ের হিন্দু দুষ্কৃতিকারীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন, ভ্রাতার শাহাদাত বরণে হযরত হিশাম উদ্দীন খুবই মর্মাহত হন ও আজমীর শরীফ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বৎসর। এক রাতে তিনি পিতা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে বাশারত লাভ করে পূর্ব দিকের দেশে গমন করেন এবং দ্বীনের খেদমত করার নির্দেশ লাভ করেন। এই অবস্থায় কাউকে না জানিয়ে একদিন গভীর রাতে হেঁটে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, একই সময়ের কিছু পূর্বে হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লীর হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ১২জন আউলিয়া সহযোগে বঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে আরও বহু আউলিয়া কেরাম তাঁর সঙ্গী হন। হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র এই কাফেলায় সঙ্গে হুশাম উদ্দীন মুলতান, ইরান, আফগানিস্তান বিহার প্রভৃতি দেশ হেঁটে পাড়ি দেন। পরে বঙ্গদেশের সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। সপ্তগ্রাম তখন ছিল মুসলিম সুলতান শামস-উদ্দীন ফিরোজ শাহর রাজ্য লাখণৌতির অন্তর্গত।

পরে শ্রীহট্টে (সিলেটে) হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সঙ্গে তিনি এখানে অবস্থান করেন। তাঁর ছোহবতে ফয়জ ও বরকত লাভ করেন। হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর নাম রাখলেন শরফুদ্দীন। সেই থেকে হযরত হুশাম উদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত খাজা শরফুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি নামে পরিচিতি লাভ করেন, এরপর ৭০৩ হিজরীর ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি হযরত শাহ্ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র নির্দেশে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট থেকে দক্ষিণ বঙ্গের দিকে নৌকাযোগে যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ শরীফে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে সুফি দরবেশদের পরামর্শে রমনা নামক এক গ্রামে অবস্থিত এক কালী মন্দিরের পাশে বসবাসকারী জনগণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নামেন। তিনি ওই এলাকার উদ্দেশ্যে সোনারগাঁও থেকে নৌকায় রওনা হন। নৌকার মাঝির জানা মতে তিনি ওই কালীমন্দিরের কাছাকাছি স্থানে আসার জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত এক খালে পথের শেষ প্রান্তে আসেন। পরে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ কিন্তু সরু এক পায়ে চলার পথের পাশে অবতরণ করেন। স্থানটি নির্জন ও লোকালয় শূণ্য হওয়ায় তাঁর খুব পছন্দ হয়। এখানেই তিনি আস্তানা গাড়েন। এই খালটি দিয়েই ওলী-এ বাংলা ওই স্থানে এসে নৌকা থেকে অবতরণ করেন। অষ্টম শতাব্দীতে এখানে শিখ ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় গুরুদুয়ারা নানক শাহী প্রতিষ্ঠিত হয়, ১১০০ খ্রিস্টাব্দ নেপালের বদ্রীনাথ যোশী মঠের শংকরাচার্য স্বামী গোলাপ গিরির নেতৃত্বে একদল তীর্থ দর্শনার্থী রমনা গ্রামে এসে আস্তানা গড়ে তোলেন। তখন মানবসেবার ব্রত নিয়ে এ মহান ওলীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো- 'আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই উচ্চারণে সিরাতুল মুস্তাকীম স্পষ্ট হয়ে উঠে পথভ্রষ্ট মানবকুলের সামনে। হিজরী ৭০৪ মোতাবেক ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দ ওলী-এ বাংলা এখানকার আস্তানা থেকে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত হন। ওলী-এ বাংলার চারিত্রিক সাধু ও পুণ্যাত্মার পরিচয় পেয়ে হিন্দু জনগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। দীক্ষিত হতে থাকেন ইসলাম ধর্মে। তিনি এই অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। শত শত হিন্দু তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কালী মন্দিরের তান্ত্রিকরাও ওলী-এ বাংলার নিকট ইসলামের ছায়া সুশীতলে আশ্রয় নেন। এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে মুসলিম লোকালয় গড়ে উঠে। তাঁর নামের চিশতী পদবীর কারণে এলাকাটি চিশতীয়া মহল্লা নামে পরিচিত হয়ে উঠে। চিশতীয়া মহল্লায় বাড়িঘর মসজিদ ও কবরস্থান ছিল। প্রায় ৬০০ বছর পর ১৯০৫ সালে এই স্থানে পূর্ব বাংলা প্রদেশের বড় লাটের বাসগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে বৃটিশ সরকার। কবরস্থান নিশ্চিহ্ন করে গভর্মেন্ট হাউস নির্মাণ করা হয়, যা আজকের পুরাতন হাইকোর্ট ভবনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

শাহ চিশতী জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচারে যে সংগ্রাম করে গেছেন, তারই ধারাবাহিকতায় রমনা ছাড়িয়ে ইসলামের মহান বাণী দূর নিকটে সর্বত্র পৌঁছে যায়। শত শত মানুষ তাঁর ছোহবতে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও ইসলাম প্রচারে কঠোর সাধনার কারণে তিনি ওলী-এ বাংলা নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।

হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ

চৌদ্দশত শতাব্দীতে একজন মুসলিম দরবেশ রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। তিনি হলেন শাহ্ মখদুম রূপোশ। মখদুম অর্থ ধর্মীয় নেতা। রূপোশ অর্থ আচ্ছাদিত। শাহ মখদুমের আসল নাম ছিল আবদুল কুদ্দুস জলালুদ্দীন। বিভিন্ন সময়ে ধর্ম এবং জ্ঞান সাধনায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তাঁর নামের সাথে শাহ্ মখদুম রূপোশ নামগুলো যুক্ত হয়। হযরত শাহ্ মখদুম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বংশধর ছিলেন। মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রাব্বানী গাউসুল আযম দস্তগীর, হযরত মীর মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী ছিলেন তাঁর আপন পিতামহ।। ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বড় ভাই সৈয়্যদ আহমদ ওরফে মীরন শাহকে নিয়ে বাগদাদ থেকে এ দেশে আসেন।

কাঞ্চনপুরের সন্নিকটে শ্যামপুরে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের চারঘাট থানায় চলে যান, প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, চিশতীয়া তরিকার একটি উপদলের দরবেশদের মতো তিনি তাঁর মুখমন্ডল টুকরো কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখতেন। এ কারণে তাঁকে 'রূপোশ' বলা হতো। কিছু দিনের মধ্যে তাঁর আবাস স্থলের নামকরণ করা হয় মখদুম নগর। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ মখদুম রূপোশ বাঘা অর্থাৎ মখদুম নগর থেকে রামপুর বোয়ালিয়ায় চলে আসেন। এখানে তাঁর আগমনে অনেক অলীক কাহিনী ও কারামত সম্পর্কে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। তিনি ঐ এলাকার তান্ত্রিক অত্যাচারি রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে শাহ্ তুরকান হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। জনগণকে অত্যাচারি রাজার হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন, এর মধ্যে রাজশাহীর হযরত শাহ্ মখদুম রাহমাতুল্লাহি আলায়হির দরগাহ রাজশাহী মূল শহরের দরগাহ পাড়ায় অবস্থিত। কারণ এটি হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাজারের পাশেই

অবস্থিত। কথিত আছে শাহ্ মখদুম কুমীরের পিঠে চড়ে নদী পার হতেন, রাজশাহী এসেছিলেন কুমীরের পিঠে বসে। এ কারণে সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বর্তমানে শাহ্ মখদুম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর কবরের পাশে সেই কুমীরের কবর রয়েছে।

হযরত শাহ্ শাহ আলী বোগদাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

রাজধানী ঢাকার মিরপুর বাসীর নিকট হযরত শাহ্ আলী বোগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। তিনি ২০ বছর বয়সে ১০০জন সুফী-সাধক ও দরবেশ নিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য বাগদাদ হতে দিল্লী আসেন। সেই সময় তুঘলক বংশের শেখ সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তিনি ইরাক থেকে আসার সময় প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র কেশধাম মুবারক ও বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জুব্বা নিয়ে আসেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন রাজপুত্র। মহান আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি (শাহ্ আলী বাগদাদী) আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে মাতৃভূমি বাগদাদ ত্যাগ করেন। পরে দিল্লীতে এসে তিনি আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশিত পথে ইলমে তাসাউফ অর্জন করেন। তিনি সৈয়্যদ আলাউদ্দীন শাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র এক রাজ কন্যাকে বিয়ে করেন। এই সময় তাপস শাহ্ আলী বোগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র পরিচয় দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ৮৩৭ হিজরী বা ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে ফতেহাবাদে আগমন করেন। সেখান থেকে তিনি ঢাকার মিরপুরে চলে আসেন, এখানে এসে তিনি বিধর্মীদের অত্যাচারের মুখোমুখি হন এবং এক মুহূর্তের জন্য তিনি আল্লাহর একত্ববাদ, ইসলাম প্রচারে পিছপা হননি, ব্যক্তিগতভাবে তিনি চিশতীয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন। তাঁর সময় পুরো মিরপুর গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সে সময় সমগ্র মিরপুরে হাজার হাজার মূর্তি পূজারী মূর্তিপূজা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হন। হযরত শাহ্ আলী বোগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শেষ বয়সে মোরাকাবা করতে গিয়ে একাধারে চল্লিশ দিন হুজরাখানায় অবস্থান করছিলেন। চল্লিশদিন অতিবাহিত হবার পরও তিনি হুজরাখানা হতে বের হতে না দেখে শিষ্যরা দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে দেখেন এই মহান অলী ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট চলে গেছেন। তিনি সারারাত নফল নামায আদায় করতেন। বছরের ছয় মাস নফল রোযা রাখতেন, ঢাকার মিরপুর- ১ নম্বর এ সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ্ আলী বোগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির পবিত্র মাজার শরীফ রয়েছে। শত শত ভক্ত অনুরক্ত মাজার জিয়ারত করছেন অহরহ।

[তথ্য সূত্র: বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে পীর আউলিয়া-মুস্তফা কাজল]

লেখক: প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

ফতোয়া

ছবি তোলা ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

ভাস্কর্য নির্মাণ, ছবি তোলা বৈধ না হারাম, বর্তমানে এ বিষয়ে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলছে। ইসলামী শরিয়ত তথা ক্বোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিকোণে ও ফিক্বহ্ ফতোয়ার আলোকে উপরোক্ত বিষয়ে শরয়ী ফয়সালা প্রদত্ত হলো। যাতে বিভ্রান্তি নিরসন হয়। মুসলিম মিল্লাত ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে মুক্তি পায়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بُيُتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ

অর্থাৎ রহমতের ফেরেশতা ওইসব ঘরে প্রবেশ করেননা, যাতে কুকুর ও ছবি থাকে। [ছহি বুখারী-হাদিস নং-৫৩২২]

এ হাদীস ছাড়াও ছবি সম্পর্কিত অপরাপর হাদীসের আলোকে ছবি অঙ্কন করা বা ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা তোলাকে সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কতেক ওলামা যেসব ছবির শরীর ও ছায়া নেই সেসব ছবিকে বৈধ বলেছেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীসকে তাঁদের সমর্থনে পেশ করেন। যেমন-

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بُيُتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسَرٌ ثُمَّ اشْتَكى زَيْدٌ فَعدنَاهُ فَاِذَا عَلى بَابِهِ سَتَرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِىْ ربيب ميمونة زوج النَّبىُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَمْ يَخْبُرْنَا زَيْدٌ عَن الصُّوْرِ يَوْمَ الْاَوَّلُ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ اَلَمْ تَسْمَعَه حِيْنَ قَالَ اِلَّا رَقَمًا فِىْ ثَوْبٍ

[بخارى جلد ٥٨٤ - ج - ٢, ١٨٨ص]

অর্থাৎ যায়েদ ইবনে খালেদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (বর্ণনাকারী বলেন) বুসর বলেছিলেন, হযরত যায়েদ অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম, তখন তাঁর ঘরের দরজায় ছবি ওয়ালা পর্দা দেখতে পাই। আমি ওবায়দুল্লাহ্ খাওলানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, যায়েদ আমাদেরকে কি পূর্বে ছবি থেকে নিষেধ করতেন না? হযরত ওবায়দুল্লাহ্ বললো, তুমি কি শুননি যে, তিনি কাপড়ের উপর অঙ্কিত ছবিকে পূর্বের হুকুম থেকে পৃথক করে থাকেন। অর্থাৎ কাপড়ের উপর অঙ্কিত ছবিকে তিনি অসুবিধা মনে করেন না।

[বুখারী, ১ম খন্ড-পৃ. ৪৮৫, ২য় খন্ড, পৃ.-৮৮১]

আল্লামা নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ হাদীসের ব্যাখ্যায়ে লিখেছেন যে-

هذا يَحْتَجُ به مَنْ يَقُوْلُ باباحة مَا كَانَ رَقَمًا مُطْلَقًا

যারা মুতলাক বা সাধারণভাবে কাপড়ের উপর অঙ্কিত ছবির বৈধতা বলে থাকেন তারা এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। [ইমাম নববী, শরহে মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০০]

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

اِنَّ مَذْهَبَ الْحَنَابَلَةِ جَوَازُ الصُّوْرَةِ فِى الثَّوْبِ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلى مَافِىْ خَبَرَ اَبِىْ طَلْحَةَ لكِنْ اِنْ سَتَرَ بِهِ الْجِدَار مَنَعَ عِنْدَهُمْ قَالَ النَّوَوِىْ وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ اِلى اَنَّ الْمَمْنُوْعَ مَا كَانَ له ظِلٌّ له وَمَالاظِلَّ له فَلاَ بَأْسَ بِاتِّخَاذه مُطْلَقًا

অর্থাৎ হাম্বলী মাযহাব মতে সাধারণভাবে কাপড়ের উপর অঙ্কিত ছবি বৈধ। যা আবু তালহার হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। অবশ্য যদি ওই ছবি দিয়ে দেয়ালে পর্দা দেয়া হয় তবে তা তাঁরা নিষেধ করেন। আল্লামা নববী বলেন- পূর্ববর্তী কতেকের মাযহাব এ ছিলো যে, যেসব ছবির ছায়া নেই তা বানানো সাধারণভাবে বৈধ। আর যেসব ছবির ছায়া আছে তা নিষিদ্ধ। [ফতহুল বারী, শরহে ছহি বোখারী, ১০ম খন্ড, পৃ. ৯২]

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুরুর দিকে ছবি তৈরী করা ও সংরক্ষণ করাকে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে নকশাকৃত বা অঙ্কিত ছবির

ফতোয়া

ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন-

وَاِنَّمَا نَهَى الشَّارِعَ اَوَّ لاً عَنِ الصُّوْرِ كُلِّهَا وَاِنْ كَانَتْ رَقْمًا لِاَنَّهُمْ كَانُوْا حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِعِبَادَةِ الصُّوْرِ فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ جُمْلَةً ثُمَّ لِمَا تَقرر نهيه عَنْ ذٰلِكَ اباح مَا كَانَ رَقْمًا فِى الثَّوَبِ لِلضَّرُوْرَةِ -

অর্থাৎ শারে' আলাইহিস্ সালাম প্রথম দিকে প্রত্যেক ধরনের ছবি তৈরীকে নিষেধ করেছেন, যদিও তা কাপড়ের উপর নকশাকৃত হোক না কেন। কেননা ওই সময় লোকেরা ছবির ইবাদত করতে অভ্যস্থ ছিল। এ জন্য সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। আর যখন ওই নিষেধাজ্ঞার কারণ উঠে যায় তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন বশতঃ কাপড়ের উপর নকশাকৃত বা অঙ্কিত ছবির অনুমতি দেন।

[আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ওমদাতুল ক্বারী, খন্ড-২১, পৃ. ৭৪]

হাদীসের মধ্যে এ ধরনের অনেক উদাহরণ দেখা যায়, যেমন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মত কবর পূজার প্রতি ধাবিত হওয়ার আশঙ্কায় প্রথম দিকে কবর জিয়ারতকে নিষেধ করেছিলেন। যখন মুসলমানদের অন্তরে তাওহীদের বা আল্লাহর একত্ববাদ সুদৃঢ় হয়ে যায় তখন আবার কবর জিয়ারতের অনুমতি দেন। তেমনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকদের মধ্যপানের অভ্যস্থতার কারণে ওইসব পাত্রের ব্যবহারও নিষেধ করে দেন; যা দ্বারা মধ্যপান করা হতো। পরে মুসলমানরা যখন মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলো তখন ওইসব পাত্র ব্যবহারও বৈধ হয়ে যায়।

অতএব, উপরোক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হলো যে, পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এবং হাম্বলীরা মুতলাক বা সাধারণভাবে শরীর বিহীন (গায়রে মুজাস্সাম) ছবি অঙ্কন করা বৈধ বলে মত পোষণ করেন। আর মালিকীদের মধ্যে বিশেষতঃ আল্লামা কুরতবী, শাফেয়ীদের মধ্যে আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শরীর বিহীন ছবির ব্যাপারে বৈধতার পক্ষে রায় দেন। আর আমাদের হানাফীদের মধ্যে বিশেষতঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলায়হিও শরীর বিহীন ছবিকে প্রয়োজন বশত! বৈধ বলে মত পোষণ করেন। অবশ্যই ফক্বীহ্গণ শরীর সমেত (মুজাস্সাম) ছবিকে হারাম বলেছেন। (যেমন-কারো মূর্তি/ভাস্কর্য তৈরী করা) আর যেসব ফক্বীহ্ বিশেষ প্রয়োজনে শরীর বিহীন (গায়রে মুজাসসাম) ছবির বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসাযোগ্য- এ জন্য যে, তাঁরা ছবি হারাম হওয়ার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন আর প্রয়োজনে শরীরবিহীন ছবির অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, আজকের যুগে হজ্ব, উমরা, বিদেশ ভ্রমণ, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ইত্যাদিতে রেকর্ড ও চ্যালেঞ্জের জন্য ছবির প্রয়োজন হচ্ছে। তাই এসব ক্ষেত্রে ছবি তোলা, সংরক্ষণ করা অবৈধ হতে পারে না। কারণ, এসব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছবি তোলা ও সংক্ষরণ করা যদি হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী বলা হয় তবে দ্বীনের সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা অবধারিত হয়। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ব্যাপারে কোন সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা রাখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দ্বীনের সঙ্কীর্ণতা বা কঠিনতা রাখেননি। [সূরা হজ্ব, আয়াত-৭৮]

আরো বলা হয়েছে-

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে সহজতর ইচ্ছা পোষণ করেন আর কঠিনতর ইচ্ছা করেন না। [বাক্বারা, আয়াত-১৮৫]

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السمحة

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় দ্বীন হলো তা, যা সত্য ও সহজ। [বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১০]

আরো এরশাদ হচ্ছে-

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا [صحيح مسلم - جلد - ٣- صفحه ٨٣]

অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, লোকের জন্য সহজ কর আর তাদের উপর কঠোর করো না। তাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বৈধ। যা যুগের চাহিদাও। তাই প্রত্যেক যুগের ফক্বীহ্, মুফতি, কাজী ও আলিমগণ যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে শরয়ী মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। তাই আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন-

ফতোয়া

فَلَا بُدَّ لِلْمُفْتِىْ وَالْقَاضِىْ بَلْ وَالْمُجْتَهِدِيْنَ مَعْرِفَةُ اَحْوَالِ النَّاسِ وَقَدْ قَالُوْا وَمَنْ جَهَلَ باهل زَمَانِه فَهُوَ جَاهِلٌ

অর্থাৎ মুফতি, কাজী এবং মুজতাহিদগণের জন্য স্বীয় যুগের হাল ও অবস্থা জানা জরুরী। কারণ ফক্বীহগণ বলেছেন যে, যে স্বীয় যুগের চাহিদা ও অবস্থা জানা থেকে অজ্ঞ সে নিরেট মূর্খ।

[রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৬, লাহোর হতে প্রকাশিত]

অবশ্য সম্মানার্থে বা মুহাব্বতের প্রেক্ষিতে কোন পীর-বুযুর্গ বা যে কোন ব্যক্তির ছবি তোলা ও প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ ছবি হারাম হওয়ার মূলে হলো গায়রুল্লাহর সম্মান ও ইবাদত। যদি লোকেরা প্রাণীর ফটোকে সম্মান ও ইবাদত শুরু করে দেয় তবে এটা অবশ্য হারাম।

আরো উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু জাফর তাহাবী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ছবির মুখ্য অংশ মাথার অংশ। যে ছবির মাথার অংশ নাই, তা ছবি হিসেবে গণ্য নয়। সুতরাং মাথা ও মুখমন্ডল ছাড়া ছবি রাখতে অসুবিধা নেই। ফক্বীহগণ আরো বলেছেন, যদি কোন প্রাণীর বা মানুষের ছবি ঘরের দেয়ালে সামনে বা ডানে-বামে লটকানো হয় বা শোভা প্রদর্শনের জন্য আলমিরা ইত্যাদিতে সাজিয়ে রাখা হয় যা বর্তমানে অনেক ঘরে দেখা যায় তা অবশ্যই মাকরূহে তাহরীমা বা গুনাহ্। আর উক্ত কামরায় সাজানো ছবিসমূহকে সামনে বা ডানে-বামে রেখে নামায আদায় করাও মাকরূহ ও গুনাহ্।

[রদ্দুল মুহতার ও হিন্দিয়া]

ছহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

أُوْلٰئِكَ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِه مَسْجِدًا ثُمَّ صُوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَر شرار خلق اللهِ - صحيح البخارى وسلم

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে কোন নেক্কার বুযুর্গ ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে তখন তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তরা তাঁর কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে উক্ত মসজিদে ওই বুযুর্গ ব্যক্তিগণের ছবি নির্মাণ করত। তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। [ছহীহ্ বুখারী ও মুসলিম]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

اى صور الصلحآء تذكيرابهم ترغيبا فى العبادة لاجلهم ثم جآء من بعدهم فزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لهم سلفكم يعبدون هذه الصور فوقعوا فى عبادة الاصنام [مرقاة]

অর্থাৎ পূর্ববর্তী বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের ইন্তিকালের পর তাদের স্মরণার্থে তাঁদের ছবিসমূহ ইবাদতে উৎসাহ্ সৃষ্টির জন্য মসজিদে টাঙ্গিয়ে রাখতো। অতঃপর তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের শয়তান প্রতারণা করে বলতো, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এসব বুযুর্গ ব্যক্তিদের ছবিসমূহকে ইবাদত করত, তাই তোমরাও কর। এভাবে তারা মূর্তি পূজোয় লেগে যায়। [মিরকাত শরহে মিশকাত]

বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, মক্কার কাফিরগণ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম ও হযরত মারয়াম আলায়হাস্ সালামের ছবিসমূহ পবিত্র কা'বা ঘরের দেয়ালে নকশা করে রেখেছিল। মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে উক্ত ছবিসমূহ অপসারণ করার নির্দেশ দেন। আর প্রিয়নবী মক্কা শরীফের ভেতরে ছবির কিছু নমুনা ও নিশানা দেখলে তাও পানি দ্বারা মুছে দেন এবং যারা এ কাজ করেছে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক। [তাহাবী ও সুনানি আবু দাউদ]

শরহে মায়ানিউল আছার এ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, একদা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম প্রিয়নবীর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমি গত রাতে এসেছিলাম; কিন্তু ঘরের পর্দায় কিছু প্রাণীর ছবি থাকায় আমি প্রবেশ করিনি। আপনি ছবির মাথা বা উপরিভাগ কেটে ফেলার জন্য নির্দেশ করুন। যেন তা বৃক্ষের মত হয়ে যায়। অতঃপর রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন।

[শরহে মায়ানিউল আছার, কৃত. ইমাম তাহাবী রহ., ইমাম কাছানী হানাফী রহ. এর বাদাঈয়ুস সানাঈ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৫]

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ছবির উপরিভাগ ধ্বংস করে উম্মতকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত হানাফী ফক্বীহ্ ইমাম মরগিনানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছবি সংক্রান্ত মাসআলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন-

ولوكانت الصورة صغيرة بحيث لاتبد والناظر لايكره لان الصفار جدا لاتعبد واذا كانت التمثال مقطوع الراس اى ممحوا الراس فليس بتمثال لانه لايعبد بدون الراس كما اذا صلى الى شمع اوسراج على ماقالوا ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة او على بساط مفروش لايكره

ফতোয়া

لانها تدالس وتوطا بخلاف اذا كانت منصوبة او كانت على سترة لانه تعظيم لها ..الخ - الهداية اولين - صفحه ١٢٢

অর্থাৎ ছবি যদি এমন ছোট হয়, তা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না, তবে এমন ছবি মাকরূহ নয়। নেহায়ত ছোট ছবির উপাসনা করা যায়না। আর যদি ছবির মাথা কর্তিত হয় তাও ছবি হিসেবে গণ্য হয় না, কারণ মাথা বিহীন ছবির ইবাদত করা হয় না। তা বাতি বা চেরাগ (সামনে নিয়ে) নামায পড়ার মত। অর্থাৎ যেভাবে বাতি বা চেরাগকে সামনে নিয়ে নামায পড়তে অসুবিধা নাই তদ্রুপ মাথাবিহীন ছবিকে সামনে নিয়ে নামায পড়তে অসুবিধা নেই।

তেমনিভাবে ফাতহুল বারীতে ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (১০ম খন্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন-

فاما لوكانت ممتهنة وغير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها اما قطعها من نصفها او بقطع رأسها فلا امتناع - فتح البارى - جلد ١٠ صفحه - ٣٩١

অর্থাৎ যদি ছবিকে অসম্মানের সাথে রাখা হয় এবং তার আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হয় বা ছবির অর্ধেক কেটে দেয়া হয় বা মাথা কেটে ফেলা হয় তাহলে এ ছবি রাখাতে কোন বাঁধা নেই। অর্থাৎ তা হারাম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত নয়।

[ফাতহুল বারী, ১০ম খন্ড, পৃ. ৩৯১]

অতএব, উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা, ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের বর্ণনা ও উদ্ধৃতি দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপাসনা, সম্মান প্রদর্শন ঘর বা আলমিরার শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে মানুষ ও প্রাণীসমূহের ছবি ঘরে বা দেয়ালে টাঙ্গানো এবং ভাস্কর্য নির্মাণ অবশ্যই ইসলামী শরীয়তের বিধানমত নিষিদ্ধ ও গুনাহ। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে চাকুরী, পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রেকর্ডের জন্য ফাইল বন্দী ছবিসমূহ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট জ্ঞান ও ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানার নিমিত্তে সরকারী-বেসরকারী যাদুঘর বা বিশেষ প্রতিষ্ঠানসমূহে পূর্বের নানা মনীষীগণের ছবি সংরক্ষণ বা ধারণ করে রাখা বিশেষ প্রয়োজনে হারাম বা মাকরূহ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এসব জরুরী বিষয় ও ইমামগণের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনা না করে ঢালাওভাবে প্রাণীর ছবির বিষয়ে সাধারণভাবে হারাম ও গুনাহে কবীরা ইত্যাদি ফতোয়া প্রদান করা সীমালঙ্ঘন ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য মানুষের ভাস্কর্যের বিষয়ে চুপচাপ কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ভাস্কর্যের বিষয়ে তুমুল হৈ-চৈ এবং আন্দোলনের ডাক দেয়া কখনো হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামের আদর্শ হতে পারে না বরং তা দেশে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির নামান্তর। আর ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি খুন হত্যার চেয়েও জঘন্যতম অপচেষ্টা। উপরোক্ত বিষয়ে এটাই ইসলামী শরিয়তের ফতোয়া/ফয়সালা। এ বিষয়ে তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে পূর্বে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক : অধ্যক্ষ-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

অধ্যক্ষ মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ রায়হান শরীফ**
শিক্ষার্থী-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা
চট্টগ্রাম।

❓ **প্রশ্নঃ** দুই সাজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় কোন দোয়া পড়া জায়েয কিনা? কি দোয়া পড়তে হবে? কিতাবের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖 **উত্তরঃ** দুই সাজদার মধ্যখানে সোজা হয়ে বসে দুআ পড়া সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা। এটা হাদীসে পাক থেকে প্রমাণিত। অস্বীকার করা বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন প্রকার সুযোগ নেই। হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের দু সাজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দুআ পড়তেন। যেমন হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদার মাজখানে পড়তেন- رَبِّ اغْفِرْلِىْ (রাব্বিগ্‌ফিরলী)।

[সুনানে নাসাঈ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ৮৪]

এ ছাড়া অন্য দুআর কথাও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তাহলো- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَارْفَعْنِىْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদীনী ওয়াজবুরনী ওয়া-আফিনি ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী।

এ দুআটিও পাঠ করা যাবে। হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে ৮৫০ নং, সুনানে তিরমিযি শরীফে ২৮৪ ও ২৮৫ নং, সহীহ্ মুসলিম শরীফ ৮৯৩ নং এবং সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে ৮৮৯ নং হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। যদিও বা কোন কোন ইমাম উপরোক্ত দুআ শুধু নফল নামাযের সাজদার ক্ষেত্রে বৈধ বা উত্তম বলেছেন। তবে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজের ক্ষেত্রেও যেহেতু নিষেধ করা হয়নি। বিধায় সকল প্রকার নামাযে দুই সাজদার মাঝখানে উক্ত দোয়া পড়তে অসুবিধা নেই বরং উত্তম।

✍ **মুহাম্মদ মঈনুল কাদের রেজভী**
ছাত্র-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা

❓ **প্রশ্নঃ** আকীকা করা কি সুন্নাত? আক্বীকার জন্য গরু বা ছাগল যবেহ করে এদের পেট (ভূঁড়ি) ঘরের সামনে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হয় কি না? ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

📖 **উত্তরঃ** নবজাতক সন্তানের পিতার পক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় পূর্বক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আক্বীকা করা সুন্নাতে মুস্তাহাব। সম্ভব হলে নবজাতকের জন্মের সপ্তম (৭ম) দিনে আক্বীকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে ১৪তম বা ২১তম অথবা যে দিন সম্ভব হয় সেদিন আক্বীকা করা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জন্মের ৭ম দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম। উল্লেখ্য যে, নবজাতক শিশু জন্মের ৭ম দিনে আক্বীকা করা হলে আক্বীকার পশু যবেহ করার পূর্বে তার মাথা মুন্ডন করা সুন্নাত এবং নবজাতকের কর্তিত চুলের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য অথবা তার সম পরিমাণ মূল্য সদকা করাও মুস্তাহাব্বা। নবজাতক ছেলে সন্তান হলে ২টি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা অথবা গরু-মহিষের ৭ (সাত) অংশের দুই অংশ আক্বীকা করবে। এটা উত্তম। গোটা গরু দিয়েও আকিকা করতে অসুবিধা নেই।

আর সন্তান কন্যা হলে একটি ছাগল বা ভেড়া অথবা গরু-মহিষের এক অংশ আক্বীকা করবে। কোরবানীতে যে সমস্ত পশু যবেহ করা যায় এবং কুরবানীর পশুর প্রকারভেদে বয়সের ক্ষেত্রে যে বিধান ও নিয়ম আক্বীকার পশুর ক্ষেত্রেও হুবহু তাই লক্ষ্যণীয়। যদিও কুরবানীর উপযুক্ত সব প্রাণী দ্বারা আক্বীকা করা যায়; কিন্তু বকরি অথবা ছাগল দ্বারা আক্বীকা করা উত্তম। কুরবানীর পশুর ন্যায় আক্বীকার পশুর গোশতও তিন ভাগ করে এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য, এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকিনের জন্য সাদকা করে দিয়ে বাকি এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা। অবশ্য ঘরের মানুষ বেশী হলে সব গোশত ঘরেও রেখে দেয়া যায়। আবার সব বিলিও করে দেয়া যাবে। আক্বীকার গোশত স্বচ্ছল আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়া যায়। তাছাড়া নবজাতকের মা-বাবা, দাদা-দাদী ও নানা-নানী সবার জন্য খাওয়া জায়েয। আক্বীকার দ্বারা নবজাতকের উপর থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। দানশীলতার বিকাশ ঘটে, গরীব-মিসকিন ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় হয়। পরস্পর হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

সুতরাং, উপরিউক্ত সুন্নাতসম্মত পন্থায় আক্বীকা করবে। তবে আক্বীকার পশু যবেহ করার পর পশুর নাড়িভূঁড়ি ঘরের দরজায় কাপড় দিয়ে মোড়িয়ে পুঁতে ফেলতে হবে এ ধরনের কোন শর্ত-শরায়েত নেই। অবশ্য হালাল পশুর নাড়ি-ভূঁড়ি যে কোন স্থানে পুঁতে ফেলবে যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়।

আক্বীকা সম্পর্কে হাদীসে পাকে উল্লেখ আছে যেমন-

وعن عائشة رضى الله عنهما قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة [جامع ترمذى وابوداؤد]

অর্থাৎ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নবজাতক ছেলে সন্তানের জন্য ২টি সমবয়সী ছাগল আর কন্যা সন্তানের জন্য ১টি ছাগল আকীকা করার নির্দেশ করেছেন।

[তিরমিযি শরীফ, ১ম খন্ড, ১৮৩পৃ. ও আবু দাউদ শরীফ ২য় খন্ড, ৪৪পৃ.]

অপর হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عن على ابن ابى طالب رضى الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة

অর্থাৎ হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হাসানের জন্য ১টি ছাগল দ্বারা আকীকা করেছিলেন।

[তিরমিযী ও আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪পৃ.]

হাদীস শরীফের মর্মার্থ হলো- আর্থিক অসুবিধা হলে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে ১টি ছাগল দ্বারাও আকীকা করা যায়েয। তবে ছেলে সন্তানের পক্ষ ২টি ছাগল দ্বারা আক্বীকা করা উত্তম ও সুন্নাত তরীকা।

ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন-

نذرت امرأة من ال عبد الرحمن بن ابى بكر ان ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا فقالت عائشة رضى الله عنها لابل السنة افضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة الحديث

অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের এক মহিলা মান্নত করল যে, আব্দুর রহমানের স্ত্রীর ঘরে কোন নবজাতকের জন্ম হলে আমরা উট যবেহ করে আকীকা করব। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ রকম না করে উত্তম হলো নবজাতক ছেলে হলে ২টি সমবয়সী ছাগল আর কন্যা সন্তান হলে একটি ছাগল জবেহ করবে।

[মুস্তাদরাক হাকেম, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৩৮, মিশকাত শরীফ, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ শরীফ ও যুগ জিজ্ঞাসা, পৃ. ৩১৯]

✍ **মুহাম্মদ খোরশেদ আলম**
গহিরা, উত্তরসর্তা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

❓ **প্রশ্নঃ** আমার এক আত্মীয়ের দাফনের পর কবরের উপর আযান দেয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। জানার বিষয় হলো- এটা শরীয়তসম্মত কিনা? এ ব্যাপারে জানালে ধন্য হবো।

📖 **উত্তরঃ** মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ বা দাফন করার পর কবরের উপর আযান দেয়া জায়েয ও মুস্তাহাব। এটাকে নাজায়েয বেদাআত ও গুনাহের কাজ বলা সীমালঙ্ঘন এবং শরীয়তের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। এতে মৃত ব্যক্তির জন্য অনেক উপকার রয়েছে। যেমন- এটা দ্বারা কবরে মৃত ব্যক্তির জন্য তলকিন হয়ে থাকে। মুনকির-নাকিরের সওয়ালের জবাব দান সহজ হয়ে থাকে এবং মৃত ব্যক্তিকে

দাফনের পর তলকিন করা সম্পর্কে প্রিয়নবীর নির্দেশও পালিত হয়ে থাকে। কেননা اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللهُ দ্বারা তোমার প্রভু কে? সেই প্রশ্নের জবাব হয়ে যায় আর اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهَ দ্বারা তোমার নবীজি কে? সেই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যায় এবং حَيَّ عَلَى الصَّلَاوة দ্বারা তোমার দ্বীন কি? তার জবাব হয়ে যায় অর্থাৎ আমার দ্বীন হল ওটা যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায রয়েছে। আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ প্রসঙ্গে اِيْذَانُ الْبَاجَرِ فِىْ اَذَانِ الْقَبْرِ (ইজানুল আজর ফি আজানিল কবর) নামক একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। উক্ত কিতাবে তিনি পনেরটি দলীল লিপিবদ্ধ করেছেন এবং উক্ত দলীলসমূহ দ্বারা তিনি কবরের উপর আযান দেয়া মুস্তাহাব প্রমান করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর কবরের উপর আযান দেওয়া হলে মৃত ব্যক্তির সাত ধরনের উপকার হয়। ইমাম আ'লা হযরত আলায়হির রহমাহ্ উক্ত ফায়দাসমূহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অতএব, একটি মুস্তাহাব বিধানকে অযথা বিদআত ও গুনাহের কাজ বলা কত বড় অপরাধ একটু চিন্তা করলেই বোধগম্য হয়ে যাবে। নবীজির জাহেরী হায়াতে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগে কোন ভাল কাজ প্রচলন না থাকা তা গুনাহের কাজ হওয়ার দলিল নয়। যেমন-প্রিয় নবীজির জাহেরী হায়াতে কুরআন করিমে কোন হরকত ছিল না, দ্বীনি মাদরাসা, নাহু, সরফ, হাদীসগ্রন্থসমূহ, উসূলে ফিক্বহ, উসূলে হাদীস ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে কিতাব আকারে ছিল না অথচ বর্তমানে আমরা তা গ্রহণ করতে বাধ্য বরং এগুলো ওয়াজিব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ মৃত ব্যক্তির দাফনের পর কবরে আযান দেওয়ার রেওয়াজ ঐ যুগে ছিলনা বলে একে নব্য বিদআত ও গুনাহের কাজ বলার কোন অবকাশ নেই। কেননা এতে আযান প্রদানকারী ও মৃত ব্যক্তির অনেক ফায়দা রয়েছে।

মেরকাত শরহে মিশকাত, 'বাবুল ইতেছাম' এ উল্লেখ আছে- রঈসুল ফোকহা, জগদ্বিখ্যাত মুজতাহিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তিগণ যে বস্তুকে ভাল হিসেবে জানে তা আল্লাহর কাছেও ভাল। সুতরাং মৃত ব্যক্তির দাফন করার পর আযান দেওয়াকে প্রকৃত মুমিন বান্দারা ভাল কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে। অতএব, তা আল্লাহর কাছেও ভাল হিসেবে গণ্য হবে।

[মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমীর জা'আল হক ও আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির 'ঈজানুল আজর ফি আজানিল কবর' ফতোয়ায়ে রজভিয়া এবং আমার রচিত যুগ জিজ্ঞাসা]

✍ **মুহাম্মদ রেদোয়ান আনোয়ার**
দুলালপুর, হোমনা, কুমিল্লা

◈ **প্রশ্নঃ** শিক্ষক তার ছাত্রকে বলল, আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ্ দিলাম। কিন্তু মেয়েটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এতে কি বিবাহ্ সম্পন্ন হবে।

🕮 **উত্তরঃ** যদি ছাত্র শিক্ষকের উক্ত বিবাহের প্রস্তাবকে কবুল করেন এবং তাদের উভয়ের প্রস্তাব ও কবুল যদি কমপক্ষে দু'জন মুসলিম বালেগ আকেল পুরুষের অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার উপস্থিতিতে হয় বিবাহ্ হয়ে যাবে।

✍ **মুহাম্মদ আজিমুল মোস্তফা রেজা**
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্নঃ** কোর্টের বিবাহ্ কতটুকু শুদ্ধ? জানালে ধন্য হব।

🕮 **উত্তরঃ** ছেলে ও মেয়ে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তাদের সম্মতিতে কমপক্ষে দু'জন মুসলিম বালেগ আকেল (হুশ-বুদ্ধিসম্পন্ন) পুরুষের অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার উপস্থিতিতে যুবক-যুবতী সরাসরি ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিবাহ্/আকদ সংগঠিত করলে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ্ কার্যকর হয়ে যাবে। যদি ছেলে-মেয়ে (মুহরিমের) যাদের মধ্যে ক্বোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা বিবাহ্ শাদী নিষিদ্ধ এর অন্তর্ভুক্ত না হয়। কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত মসজিদ ও খানকাহ্ যেখানে হোক না কেন বিবাহ্ হয়ে যাবে। [হেদায়া-কিতাবুন্ নেকাহ্ অধ্যায়]

✍ **শাব্বির আহমদ**
পূর্ব লোহাগাড়া, হাজীরপাড়া

◈ **প্রশ্নঃ** বর্তমানে যে অধিক পরিমাণে মোহরানা নির্ধারণ করা হয় যদি তা সম্পূর্ণ আদায় না করে তবে স্বামী-স্ত্রী সংসার করতে পারবে কিনা?

🕮 **উত্তরঃ** স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে অধিক মোহরানা নির্ধারণ করা স্বামীর প্রতি অবিচারের শামিল। তদ্রুপ কণের পক্ষকে প্রীতিভোজ (বৈরাতী) এবং যৌতুকের জন্য জোর জবরদস্তি করা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা ধার্য করাটা ইসলামের মহান শিক্ষা। কনের পক্ষ স্বামীর

পক্ষকে আন্তরিকতার সাথে বিবাহের মোহরানা দাবী করতে ইচ্ছা করলে দোষনীয় নয়। অবশ্য মোহরানা আদায়ের পূর্বে শুভ আকদের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে ইসলামী শরীয়তে কোন অসুবিধা নেই। মোহরানা স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে আকদের সময় বা আকদের দীর্ঘ সময়ের পরেও আদায় করা যায়।

[শরহুল বেকায়া ও ওমদাতুর রেয়ায়া ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ বাবর আলী**
দেওয়ান নগর, হাটহাজারী,
চট্টগ্রাম।

❓ **প্রশ্নঃ** পিতা মাতার অনুমতিক্রমে কনের অনুমতি ছাড়া উকিল ও স্বাক্ষীগণ বিবাহ্ সম্পন্ন করতে পারে কিনা? কন্যার অনুমতিবিহীন বিবাহ্ কি শুদ্ধ হবে?

📖 **উত্তরঃ** কন্যা যদি বালেগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) হয়, তবে কন্যার অনুমতি ও সম্মতি অপরিহার্য। অনুমতি গ্রহণের সময় কন্যা চুপ থাকলেও অনুমতি/সম্মতির লক্ষণ হিসেবে ধর্তব্য হবে। মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলে ইসলামী শরিয়তের বিধান মতে মহিলারা বালেগা (প্রাপ্তবয়স্কা) হয়ে যায়। [হেদায়া ও শরহে বেকায়া, বিবাহ্ অধ্যায়]

✍ **ফয়সাল আহমদ**
আরিফপুর, বরুড়া, কুমিল্লা

❓ **প্রশ্নঃ** খালাত বোনের মেয়েকে বিবাহ্ করা যাবে কিনা?

📖 **উত্তরঃ** খালাত বোন, চাচাত বোন, মামত বোন, ও ফুফাত বোনকে বিবাহ্ করা বৈধ তদ্রূপ তাদের মেয়েকেও ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ্ করতে অসুবিধা নেই। যদিও আমাদের দেশে খালাত বোনের মেয়ে এবং চাচাত বোনের মেয়েকে বিবাহ্ করার প্রচলন নেই। তবে ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে সহোদর বোন, বৈমাত্রীয় বোন, বৈপৈত্রিক বোন ও দুধ বোনকে বিবাহ্ করা হারাম তদ্রুপ তাদের মেয়েকেও বিবাহ্ করা হারাম।

[হেদায়া, কানযুদ দাকায়েক ও বাহরুর রায়েক, নেকাহ্, অধ্যায়]

✍ **মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম**
শিক্ষার্থী- আল-আমিন বারিয়া কামিল মাদরাসা

❓ **প্রশ্নঃ** প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের অভিভাবক তার অমতে বিয়ে ঠিক করেন কিন্তু মেয়ে সে বিয়ে কখনো মেনে নেয়নি। বিয়েটা শুদ্ধ হবে কিনা?

📖 **উত্তরঃ** আকদের সময় বালেগা মেয়ে হতে সম্মতি গ্রহণ করার সময় উকিল ও সাক্ষীগণের সামনে যদি কনে/মেয়ে চুপ থাকে বা কাবিন নামায় দস্তখত করে তা সম্মতির লক্ষণ। বিধায় এতে শরিয়ত মোতাবেক বিবাহ্ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি আকদের সময় বা ইজিন নেয়ার সময় কনে যদি উকিল ও স্বাক্ষীগণের সামনে মুখে বলে আমি এ বিয়েতে রাজি নাই বা কবুল করি নাই তাহলে বিবাহ্ শুদ্ধ হবে না। তবে কোন মেয়ে বালেগা/প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তার অমতে বা তার সম্মতি ছাড়া মেয়ের পরিবার/মা-বাবা বিয়ে ঠিক করা উচিত নয়। যেহেতু পরবর্তিতে ঝামেলা সৃষ্টি হয়।

✍ **মুহাম্মদ মিজানুর রহমান**
গোশালাকান্দা, নরসিংদী

❓ **প্রশ্নঃ** দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে কী? ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সমাধান প্রদান করে বাধিত করবেন।

📖 **উত্তরঃ** এক তালাক বা দুই তালাক (এক সাথে প্রদান করা হোক বা আলাদাভাবে প্রদান করা হোক) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদানের পর ইদ্দতের মধ্যে (স্ত্রী গর্ভিতা হলে গর্ভ প্রসব করা এবং গর্ভিতা না হলে তিন ঋতুস্রাব (হায়েয) পর্যন্ত) স্বামী ইচ্ছা করলে রজয়ত করতে পারবে অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট যেতে পারবে। ৩য় তালাক না দেয়া পর্যন্ত তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর/সংসার করতে কোন অসুবিধা নেই। আর স্ত্রীকে স্বামী এক বা দুই তালাক প্রদানের পর ইদ্দতের মধ্যে রজয়ত না করলে বা স্ত্রীর নিকট না আসলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তালাকে বায়েন হয়ে যাবে তখন উভয়ের সম্মতিতে তারা সংসার করার ইচ্ছা করলে পুনরায় নুতনভাবে কমপক্ষে দুই জন মুসলিম আকেল-বালেগ স্বাক্ষীর (পুরুষের) উপস্থিতিতে বা একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলার উপস্থিতিতে আকদের মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অবশ্য স্বীয় স্ত্রীকে স্বইচ্ছায় স্বামী তিন তালাক প্রদান করলে তখন ইদ্দতের মধ্যে রজয়ত করার বা স্ত্রীর নিকট ফিরে আসার কোন সুযোগ নেই।

[ফতহুল কদির শরহে হেদায়া তালাক অধ্যায়,
কৃত. ইমাম ইবনুল হুম্মাম হানাফী (রহ.) ইত্যাদি]

📠 দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা 📠 একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে 📠 প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। 📠 প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রবন্ধ

হযরত গাউসুল আযম দস্তগীর ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে আধ্যাত্মিকতার বাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন

● পবিত্র ফাতেহা এয়াজদাহুম মাহফিলে বক্তারা

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম'র ব্যবস্থাপনায় ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন'র সভাপতিত্বে ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকাহ্-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাদ মাগরিব হতে এশা পর্যন্ত পবিত্র গেয়ারভী শরীফ, পীরানে পীর দস্তগীর হযরত শেখ সুলতান মীর মহিউদ্দিন সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)'র পবিত্র ওফাত বার্ষিকী ফাতেহা-ই ইয়াজদাহুম এবং হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রঃ)'র মা ছাহেবান'র ফাতেহা শরীফ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তারা বলেন, হযরত গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন বেলায়তের সম্রাট। আধ্যাত্মিক জগতের বহু উচুমানের অধিকারি। তিনি আধ্যাত্ম সাধনা, ওয়াজ-নসিহত ও লেখনির মাধ্যমে মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। ইসলামের নামে আবির্ভূত বিভিন্ন বাতিল ফের্কার স্বরূপ উন্মোচন করে ক্বোরআন সুন্নাহর আলোকে দ্বীন ইসলামের সঠিক রূপরেখা জনসমক্ষে তুলে ধরে বিভ্রান্তির হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরির ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তিনি মুহিউদ্দীন বা দ্বীন ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী হিসেবে মুসলিম উম্মাহর নিকট পরিচিত। তাঁর প্রবর্তিত তরিকা সিলসিলায়ে কাদেরিয়া নামে সুবিদিত। তিনি এ জগৎ থেকে পর্দা করার পর তাঁর খলিফারা এ সিলসিলার কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। ফলে প্রধান চার ত্বরীকার মধ্যে কাদেরিয়া ত্বরীকার অনুসারীর সংখ্যাই বেশি। উক্ত সিলসিলাহ্ এ দেশে প্রচারে প্রধান ভূমিকা রাখেন আওলাদে রাসূল, আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.), তিনি পর্দা করার পর তাঁর সুযোগ্য ছাহেবজাদা রাহনুমায়ে শরিয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এ ত্বরীকার প্রসার ঘটান। এরপর বর্তমানে হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.জি.আ.)'র পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত মানুষ এ হক্কানী সিলসিলায় দাখিল হয়ে ধন্য হচ্ছেন।

এতে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান ট্রাস্ট'র সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম.গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি ছৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, আনজুমান ট্রাস্ট'র সদস্য-আলহাজ্ব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার,মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক,শেখ নাসির উদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, নূর মোহাম্মদ কন্ট্রাক্টর,মুহাম্মদ আবদুল হাই মাসুম,মুহাম্মদ কমর উদ্দিন সবুর, মুহাম্মদ হাসানুর রশীদ রিপন, গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় পর্ষদের যুগ্ম সচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার,সাংগঠনিক সম্পাদক এস.এম.মাহবুব এলাহী সিকদার,চট্টগ্রাম মহানগর'র আহবায়ক মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, ছাবের আহমদ,মুহাম্মদ মনোয়ার হোসেন মুন্না, উত্তর জেলার সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সম্পাদক মাষ্টার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।

বলুয়ারদিঘি পাড় খানকায়ে কাদেরিয় সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

বেলায়তের মাধ্যমে ইসলামের পুরুজ্জীবন ও ইসলামি আধ্যাত্মিক জাগরণে গাউসুল আজম দস্তগীর হজরত আবদুল কাদের জিলানীর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকায়ে কাদেরিয় ইসলামের সঠিক পথ ও মতকে ধারণ করে আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সঠিক

পথের সন্ধান দিচ্ছে। গত ৩০ নভেম্বর নগরীর বলুয়ার দিঘি পাড়স্থ খানকায়ে কাদেরিয় সৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়ায় অনুষ্ঠিত ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। গাউসিয়া কামটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন, আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। খানকাহ শরীফের ইমাম হাফেজ মাওলানা আবুল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মাওলানা নুরুল আমিন, মাওলানা এনামুল হক, মইনুদ্দিন ফারুক, হজরত নুর মোহাম্মদ আলকাদেরীর ছাহেবজাদাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে পবিত্র গেয়ারভী শরিফ ও ফাতিহা ই ইয়াজদাহম মাহফিল গত ২৬ নভেম্বর শহরের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন, প্রধান মেহমান ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আয়ূব আলী আনসারী।প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ সাহিদার রহমান। মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কাসেম। উপস্থিত ছিলেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সম্পাদক আব্দুল মান্নান শরীফ বাবলু, সাইফুল ইসলাম, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, আলহাজ্ব নিজামুদ্দিন, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, হাসান আলী। মাওলানা মোহাম্মদ আয়ূব আলী আনসারী মুনাজাত করেন।

গত ১২ রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আলহাজ্ব আব্দুল কাদের খোকনের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালী জশনে জুলুসের আয়োজন করা হয়। রংপুর টেবিল টেনিস চত্বর থেকে অসংখ্য নবী প্রেমিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জুলুসটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জমায়েত হয়ে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আবদুল কাদির খোকন। প্রধান অতিথি ছিলেন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব আলী আনসারী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা মুহাম্মদ সাইদার রহমান। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান শরীফ বাবলু, জিয়াত পুকুর মাজার শরীফ সুন্নিয়া দাখিল মাদাসার সুপার আবুল কাসেম, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম, মুহাম্মদ আয়নাল হোসেন, মাওলানা আব্দুস সালাম, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আনছার আলী, মুহাম্মদ সামছুল আলম (ফরহাদ) প্রমুখ।

সৈয়দপুর উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সৈয়দপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৬ নভেম্বর কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে ফাতেহা ইয়াজদাহুম পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে এডভোকেট হাসনেন ইমাম সোহেলের সভাপতিত্বে ও শাহেদ আলি কাদেরির পরিচালনায় আলোচনা অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সৈয়দ ফজলুর রহমান, মাস্টার শহিদুল হক প্রমূখ।

আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রিয় সহ: সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, মাওলানা শেখ খোরশেদ আলম নুরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শিক্ষার্থী মাওলানা জুনাইদ আল হাবীব বরকাতি, কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা শাহজাদা হোসেন ও হাফেজ আব্দুল ওয়াহেদ প্রমূখ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব আলি ইমাম, মুহাম্মদ নাসিম কাদেরী, মাসুদ কাদেরী, ইসাহাক কাদেরী, আনোয়ার কাদেরী, আব্দুল ওয়াহাব রিজভী প্রমূখ।

রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গামাটি জেলার ব্যবস্থাপনায় খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়ায় পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে ওরছে গাউসুল আজম জিলানী (রহ.) গত ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল খতমে ক্বোরআন, মাদরাসা ছাত্রদের নিয়ে ক্বুসিদায়ে গাউসিয়া শরীফ প্রতিযোগিতা, খতমে গাউসিয়া ও গিয়ারভী শরীফ, বাদে এশা গাউসে পাকের জীবনী আলোচনা। মাওলানা শফিউল আলম আলকাদেরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য পেশ করেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সদস্য সচিব মুহাম্মদ আবু সৈয়দ, কাপ্তাই, আল আমিন নূরিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন নুরী, মাওলানা ক্বারী ওসমান গণি চৌধুরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ

আখতার হোসেন চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আবদুল হালিম ভোলা সওদাগর, পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী, মিলাদ কিয়াম ও মুনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

মধ্য মাদার্শা খানকাহ্ এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্স

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী পূর্ব থানা ও খানকাহ এ কাদেরিয়া তৈয়বিয়া তাহেরীয়া কমপেক্সে'র উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী, ফাতেহা ইয়াযদাহুম, মরহুম পীর ভাই-বোনদের ইছালে সওয়াব উপলক্ষে গাউসিয়া কনফারেন্স গত ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। প্রধান বক্তা ছিলেন সাদার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাওলানা সৈয়দ জালাল উদ্দীন আল আযহারী, বিশেষ বক্তা ছিলেন ড. মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম রেজা নঈমী, মাওলানা নঈমুল হক নঈমী। এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সহ-সভাপতি মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী, কক্সবাজার জেলার যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চান্দগাও থানার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুলাহ, মহানগর সদস্য মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, মোহাম্মদ আলমগীর, রাশেদ খান মেনন।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সহ-সভাপতি সেকান্দর হোসেন মাষ্টার এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মিয়া সওদাগর, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদুল আলম মিঠু, সাধারণ সম্পাদক ব্যাংকার জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক নুরুল আবছার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ লোকমান হাকিম, সহ-অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আরশাদ চৌধুরী, সমাজসেবা সম্পাদক আবদুস ছবুর, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওলানা শাহজাহান আলী, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন মোস্তফা, দফতর সম্পাদক আজাদুর রহমান, ১০ নং উত্তর মাদার্শা সভাপতি মাওলানা সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক মোহাম্মদ জামশেদ, নির্বাহী সদস্য সৌরভ হোসেন সৌরভ, মাওলানা আবদুল্লাহ শাহ, এডভোকেট ইয়াসির আরাফাত, আবুল হোসেন কোম্পানি, নাজিম উদ্দীন, লিয়াকত হোসেন, মোহাম্মদ ছরওয়ার শরীফ, এসএম সোলায়মান প্রমুখ।

পটিয়া কচুয়াই ফারুকী পাড়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া কচুয়াই ফারুকীপাড়া শাখার ব্যবস্থাপনায় কচুয়াই ফারুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদে গত ২৭ নভেম্বর মুহাম্মদ এনামুর রশিদ ফারুকীর সঞ্চালনায়, মুহাম্মদ মোরশেদ ফারুকীর সভাপতিত্বে বড়পীর হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)'র পবিত্র বার্ষিক ওরশ মোবারক (ফাতিহায়ে ইয়াজদাহুম) উপলক্ষে খতমে গিয়ারভী শরীফ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন মেম্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফারুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির আহবায়ক এডভোকেট রেফায়েত হাসান ফারুকী জসিম। প্রধান আলোচক ছিলেন পশ্চিম এলাহবাদ আহমদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা রফিকুল ইসলাম আলক্বাদেরী। বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গণি ও মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক আলক্বাদেরী। অতিথি ছিলেন, মুহাম্মদ মুছা ফারুকী, মুহাম্মদ রেজাউল করিম ফারুকী, মোহাম্মদ মহিদুল আলম ফারুকী প্রমুখ।

মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ আয়ুব ফারুকী, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ফারুকী বাবলা, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ফারুকী, মোহাম্মদ জাওয়াদ ফারুকী, মোহাম্মদ সিফাত ফারুকী বাপ্পী, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ফারুকী, মোহাম্মদ জোবায়েদ উল্লাহ ফারুকী, মুহাম্মদ মাসুদ ফারুকী, মুহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম ফারুকী (বাবু) প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি রাউজান কাজী পাড়া ইউনিট

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলার কাজীপাড়া ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম মাহফিল অনুষ্ঠিত সম্প্রতি হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আবু রায়হানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সুলতানপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আমিন। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা (উত্তর) দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা এম এ মতিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুলতানপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ও উপদেষ্টা আব্দুল মোমেন শরীফ। সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি হাজী নুরুল আলম সওদাগর, গেয়ারভী শরীফ পরিচালনা করেন মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা ইফতেখার ইমাম, হাফেজ কদরুল আলম ও হাফেজ মোহাম্মদ ফারুক। মোনাজাত করেন মাওলানা হুমায়ুন কবির জিহাদী।

গাউসিয়া কমিটি পটিয়া উত্তর ছনহরা ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার উত্তর ছনহরা ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে খানকা-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়ায় পবিত্র ফাতেহা এয়াজদাহুম মাহফিল খন্দকার হাসান মুরাদ এর সঞ্চালনায় আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে গত ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা হামেদ রেজা নঈমী, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা ফরিদুল আলম, প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির অর্থ-সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, পটিয়া উপজেলার সহ-অর্থ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজী আবু তাহের, খন্দকার শামসুল আলম, মুহাম্মদ জাফর আলী, শহিদুল আলম, জয়নাল আবেদীন, মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ,আব্দুল আলীম, ডাঃ কামাল উদ্দীন, সৈয়দ হোসেন, আহমদ নুর, নাজিম উদ্দীন, মুহাম্মদ মুসা, রশিদুল আলম, শামসুল আলম প্রমুখ।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ৬ ডিসেম্বর সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তক্বরির করেন ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়বীয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ আবদুল আলিম রিজভী। তক্বরির পেশ করেন মাহমুদ খান জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা নঈম উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানা সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, সদস্য মুহাম্মদ আহমদ সাফা, ৯নং ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহ-অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, সদস্য মুহাম্মদ মুসলিম মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জামিলুর রহমান সাকিব, ফয়েজ লেক ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ জহির উদ্দিন তুহিন, গোলপাহাড় ইউনিট সভাপতি মুহাম্মদ আলী হোসেন, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সোহেল, কৈবল্যধাম ইউনিট সাধারণ সম্পাদক ডা. জসিম উদ্দিন, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ জাকারিয়া, ইস্পাহানী ইউনিট সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ আমির হাসান, নাজমুল হোসেন তাওহিদ, মুহাম্মদ ইসতিয়াক প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি চাক্তাই চাউলপট্টি শাখা

গাউসিয়া কমি'টি বাংলাদেশ চাকতাই চাউল পট্টি শাখা আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবী ও ফাতেহা ইয়াজ দাহুম উপলক্ষে রাহমাতুল্লিল আলামিন কনফারেন্স ২৮ নভেম্বর স্থানিয় আবদুস ছোবহান সওদাগর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দীন বখতিয়ার। উদ্বোধন করেন চাক্তাই গাউসিয়া কমিটির প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব এমএম হারুনুর রশিদ। ইউনিট গাউসিয়া কমিটির সভাপতি হাজী আনিছুর রহমানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা মুফতি গোলাম কিবরিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা শফিউল হক আশরাফী, মাওলানা মনিরুল হক আলকাদেরী, কোতোয়ালী থানা (পূর্ব) সভাপতি আলহাজ্ব খায়ের মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক জাহেদ হোসেন জাহেদ, ব্যবসায়ী মোরশেদ আলম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, শেখ মোহাম্মদ জামাল, হাজী ইব্রহীম সাওদাগর, জাহাঙ্গীর আলম, নিজাম উদ্দীন চৌধুরী, আব্দুল জব্বার, অন্যন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, মোহাম্মদ সোলায়মান, সারোয়ার হোসেন, আহসান উল্লাহ, মোহাম্মদ ফরহাদ, ইমরান হোসেন সানি প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ মোহাম্মদপুর শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ জোয়ারা ইউনিয়ন আওতাধীন ৩নম্বর ওয়ার্ড (মোহাম্মদপুর) শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল সংগঠনের সভাপতি ফারুকুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত ১৩ নভেম্বর হযরত ভুঁই খাঁজা শাহ্ (রহ.) মাজার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ থানা শাখার সহ সভাপতি মুহাররম আলী ভূঁইয়া। প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি জোয়ারা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা হেলাল উদ্দিন, রশিদ আহমদ। উপস্থিত ছিলেন শফিউল আজম পারভেজ, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম, মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, রুহান উদ্দিন, হেফাজত নুর নাসিফ, মোফাজ্জল হোসেন ইফতি, মোহাম্মদ মাইমুন, তারেক হোসেন, আকিল ইবনে মোহাররম।

২০নম্বর দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ২০নম্বর দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল গত ১৬ নভেম্বর কোরবানীগঞ্জ চুল মুবারক জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মুহাম্মদ নুরুল হাসানের পরিচালনায় মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন কাদেরী, বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, মুহাম্মদ শাকেরুল্ল ইসলাম সুজনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব খায়ের মুহাম্মদ ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ জাহিদ হোসেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ আবুল হোসেন, হাবীব উল্লাহ্ মাস্টার, সাবেক সভাপতি হাফেজ ফজল আহমদ, ইমতিয়াজ উদ্দীন রনী, তাজ উদ্দিন সুমন, আবদুল মজিদ আশরাফী, মুহাম্মদ সানি, আবদুস সালাম বালি, মুহাম্মদ মিন্টু, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সাইফুদ্দিন, নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ আবুল বশর, মুহাম্মদ ফারুক, মুহাম্মদ আলম, জাহিদ হোসেন ও মাওলানা ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা যুব কাফেলা

উত্তর কুলগাঁওস্থ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা যুব কাফেলা বাংলাদেশ'র উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা ইয়াজদাহুম মাহফিল ও সংগঠনের অভিষেক গত ১০ ডিসেম্বর নতুনপাড়াস্থ শহীদুল্লাহ্ মার্কেট সম্মুখে অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আলী আলকাদেরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাসিক তরজুমানের সহ সম্পাদক আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী। প্রধান বক্তা ছিলেন আল্লামা ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, বিশেষ বক্তা ছিলেন শায়ের মাওলানা হাসান মুরাদ কাদেরী, বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা শাখার যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান, জালালাবাদ ওয়ার্ড শাখার সহ সভাপতি মুহাম্মদ সামশুল আলম চৌধুরী, ওয়ার্ড সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শহীদুল ইসলাম বখতেয়ার, মুহাম্মদ বদিউল আলম, হাফেজ মাওলানা তাওরিত রেযা, মুহাম্মদ শহর আলী প্রমুখ। মাহফিলে করোনাকালে মানবসেবা, কাফন-দাফনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধান অতিথি এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ারকে সংগঠনের পক্ষ হতে সম্মাননা প্রদান করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তা সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান বিশেষ অতিথি আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়্যব আলী।

বোয়ালখালী উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী উপজেলা ও পৌরসভা শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ১০ ডিসেম্বর বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ ময়দানে বৈশ্বিক করোনা মহামারী ভাইরাস হতে বোয়ালখালী ও দেশবাসীর পরিত্রাণের জন্য খতমে কুরআন মজিদ, খতমে সহীহ বুখারী শরীফ, খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল ও খতমে গাউসিয়া শরীফ এবং বিশেষ দোয়া মাহফিল উপজেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্ব মাওলানা মহিউদ্দীন আলকাদেরী ও সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুদ্দিনের সঞ্চালনায় উক্ত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন- গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন-বোয়ালখালী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

চৌধুরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার আরবী প্রভাষক আলহাজ্ব মাওলানা আবুল আছাদ মুহাম্মদ জুবাইয়ের রজভি, বোয়ালখালী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান এস.এম. সেলিম, আনজুমান কেবিনেট মেম্বার আলহাজ্ব আবদুস সাত্তার চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা ওবাইদুল হক হক্কানী, দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি- আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ সালাউদ্দীন, অধ্যাপক আবুল মনসুর দৌলতী, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন আলকাদেরী, এস.এম. মমতাজুল ইসলাম, এস.এম. জসিম চেয়ারম্যান, আলহাজ্ব শফিউল আযম শেফু চেয়ারম্যান, রফিক আহমদ মাস্টার, মাওলানা মোজাম্মেল হক কুতুবী, মাওলানা বোরহান উদ্দীন, সাংবাদিক সেকান্দর আলম বাবর, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, আলহাজ্ব আলম খান চৌধুরী, জাহেদুল হক তালুকদার, কাজী এম.এ. জলিল, মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মাওলানা আবু নাছের জিলানী, এস.এম. ফজলুল কবির, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, আলহাজ্ব ইসকান্দর আলম দিদার, মুহাম্মদ দিদারুল আলম, আলহাজ্ব আহমদ নবী সওদাগর, মুহাম্মদ ইসমাইল সিকদার, আবদুল হামিদ, মুহাম্মদ ওসমান, , মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, মুহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমূখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন-বোয়ালখালীতে করোনাকালীন সেবা কার্যক্রম, চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প, ফ্রি ঔষধ বিতরণ, দোয়া মাহফিল ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন। এই কার্যক্রম গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ অতিথি সহকারী কমিশনার (ভূমি) বক্তব্যে বলেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন-দাফন ও সৎকার, অক্সিজেন সেবা ও এম্বুলেন্স সেবা অদ্যাবধি চালু রেখেছেন। তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাউসিয়া কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

তাহেরিয়া-ছাবেরিয়া নূর সওদাগর সিটি জামে মসজিদ উদ্বোধন

পটিয়া পাঁচরিয়া তাহেরিয়া-ছাবেরিয়া নূর সওদাগর সিটি জামে মসজিদ উদ্বোধন ও আন্‌জুমান-জামেয়ার নিবেদিত প্রাণ হাজী নূর সওদাগর (রহ.)'র ইছালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে বোখারী ও ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল আলহাজ্ব মাওলানা গাজী আবুল কালাম বয়ানীর সভাপতিত্বে ১০ ডিসেম্বর তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূর সওদাগর-জয়নাব বেগম সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা ও হেফজখানা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্‌জুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। বক্তব্য রাখেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ ড. মাওলানা লিয়াকত আলী, শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি সোলাইমান আনসারী, প্রধান ফকিহ আল্লামা মুফতি আব্দুল ওয়াজেদ আলকাদেরী, মুহাদ্দেস আল্লামা হাফেজ ক্বারী আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ইউনুচ রজভী, মাওলানা আবু তাহের, অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কালাম আমিরী, মাওলানা হামেদ রেজা নঈমী, মাওলানা ইলিয়াছ আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তৈয়্যব, মাওলানা সৈয়দ জালাল উদ্দিন আযহারী, নূর সোপ ক্যামিকেল এন্ড ইন্ডাট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ নূর সোবহান চৌধুরী, পরিচালক মুহাম্মদ নূর আলী চৌধুরী, মুহাম্মদ নূর রহমান চৌধুরী, মুহাম্মদ নূর রায়হান চৌধুরীসহ বিভিন্ন মাদ্‌রাসার শতাধিক আলেমেদ্বীন, গাউসিয়া কমিটি ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের নেতৃবৃন্দ। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীতে আক্রান্তদের দোয়া এবং নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, দেশ ও জাতির শান্তি কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

বাঁশখালীতে তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

বাশঁখালী পৌরসভা আস্করিয়া সড়ক সংলগ্ন তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান কমপ্লেক্সের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আবু বকর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন শাকের, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ কমর উদ্দিন সবুর, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হবিব উল্লাহ মাষ্টার, আল্লামা সৈয়দ দোস্ত মোহাম্মদ (রহ.) ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জুননুরাইন, অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ আহামদ, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী, মওলানা আবদুর রহমান রেজভী, মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম, মাওলানা আবদু রহিম বক্স মাদ্রসার শিক্ষার্থী সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা

সাতকানিয়া উপজেলার তৎপরতা

সাতকানিয়া খাগরিয়া ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলা শাখার আওতাধীন খাগরিয়া ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাতকানিয়া উপজেলার সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাষ্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক এস.এম.ইলিয়াছ, সহ সভাপতি মাওলানা আবদুর নুর আনছারি, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, আখতারুজ্জামান সেলিম, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মাওলানা ইকতিয়ারুল ইসলাম। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সর্ব সম্মতিতে মাওলানা মুহাম্মদ শাহ্ আলমকে সভাপতি, মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ দিদারুল আলম সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ আবদুল আউয়ালকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

চরতি ইউনিয়ন শাখার সম্মেলন

গাউসিয়া কমিটি সাতকানিয়া উপজেলার চরতি ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ৫ ডিসেম্বর চরতি দুরদুরি মসজিদ প্রাঙ্গণে মাওলানা ফরিদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলার সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সভাপতি মাওলানা আবদুর নুর আনছারি, এস.এম. ইলিয়াছ, মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মাওলানা ইফতিখারুল ইসলাম,। উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইনকে সভাপতি, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা নজির আহমদ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মুহাম্মদ আইয়ুব আলীকে অর্থ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঢেমশা ইউনিয়ন শাখার সম্মেলন

গাউসিয়া কমিটি সাতকানিয়া ঢেমশাহ্ ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ২৮ নভেম্বর স্থানীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ শেখ সালাহ উদ্দীন। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এস.এম.ইলিয়াছ, সহ সভাপতি মাওলানা আবদুন নুর আনছারি, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, আখতারুজ্জামান সেলিম, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মাওলানা ইকতিয়ারুল ইসলাম। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে মাস্টার মুহাম্মদ ইব্রাহীমকে সভাপতি, মুহাম্মদ আবছার উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১৬ নম্বর সদর ইউনিয়ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলা ১৬নম্বর সদর ইউনিয়ন কমিটি গঠনকল্পে এক সভা গত ২০ নভেম্বর সদরস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উপজেলার সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক এস.এম.ইলিয়াছ, সহ সভাপতি মাওলানা আবদুন নুর আনছারি, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, আখতারুজ্জামান সেলিম, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মাওলানা ইকতিয়ারুল ইসলাম। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সম্মতিতে ৫১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হাফেজ মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মনজুরুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহাদত, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ মোবারক মিয়া।

ধলই ইউনিয়ন (কাটিরহাট) শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলার আওতাধীন ধলই ইউনিয়ন (কাটিরহাট) শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ১২ ডিসেম্বর কাটিরহাট আল আলী কমিউনিটি সেন্টারে কাটিরহাট শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাষ্টার আবু তালেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন

ধলই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর জামান।

কাউন্সিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মুহাম্মদ মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পশ্চিম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হারুন সওদাগর। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধলই ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবুল মনসুর, কাটিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব রফিকুল আলম চৌধুরী।

কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে ধলই ইউনিয়ন এর সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেনকে সভাপতি এবং রুকন উদ্দীন চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ধলই ইউনিয়ন (কাটিরহাট) শাখার কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু তালেব চৌধুরী, তাওহীদুল আলম কোম্পানী, আলহাজ্ব রফিকুল আলম চৌধুরী যুগ্ম-সম্পাদক অছিউদ্দীন, আনোয়ারুল আজিম, আনোয়ার হোসাইন। মাওলানা লোকমান হোসাইন সাংগঠনিক সম্পাদক, মোহাম্মদ জিয়াউল হক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, আবু জাফর মুহাম্মদ মহিউদ্দিন ওসমান দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, সৈয়দ ওসমান, মাহমুদুল হাসান সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, ওমর ফারুক অর্থ সম্পাদক, মনসুর আলম দপ্তর সম্পাদক, সৈয়দ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, সোহেল চৌধুরী সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মামুন উদ্দীন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, দেলাওয়ার হোসেন সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, তৌহিদুল আলম চৌধুরী, কাজি মাহতাব উদ্দীন, আবুল বাশার, সাইফুল ইসলাম, সিরাজুল হক মনি, নেজাম উদ্দীন, নাজিম উদ্দীন, ওবায়দুল্লাহ, জাকারিয়া মাহমুদ, আবু ইসহাক, আবুল বশর, ইব্রাহিম, আসিফুল হাসান, অধ্যাপক সেলিম উদ্দীন, এডভোকেট রাশেদুল আলম নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠান শেষে মিলাদ ক্বিয়াম ও মোনাজাত করেন মাওলানা কাজি মাহতাব উদ্দীন।

পতেঙ্গা থানা শাখার ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ও ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম উপলক্ষে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পতেঙ্গা থানা শাখার ব্যবস্থাপনায় ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান গত ২৭ নভেম্বর মাইজপাড়া গাউসিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি পতেঙ্গা থানা শাখার সভাপতি আলহাজ আবুল বশর কন্ট্রাঃ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মাইজপাড়া গাউছিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা কমিটির সভাপতি আলহাজ ছালেহ আহমদ চৌধুরী। মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অত্র মাদরাসার সুপার মাওলানা মামুনুর রশিদ, আলহাজ মাওলানা সৈয়দ আহমদ আল-কাদেরী, মাওলানা আবু ইউছুফ তাহেরী, আলহাজ জানে আলম (সর্দার), হাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস, হাজী আইউব আলী, হাজী এরশাদ আলী, মোহাম্মদ আজম। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মাওলানা ইকবাল, মাওলানা সারওয়ার আলম, আলহাজ এস.এম. হাছান, হাফেজ মাওলানা মহিউদ্দীন হাছান, হাজী মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, মাওলানা সাইফুদ্দীন, মাওলানা সাহাবুদ্দীন।

গাউসিয়া কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আবু তাহের, মুহাম্মদ নুরুল আবছার, হাজী জমির আহমদ, হাজী কোরবান আলী, হাজী এস.এম মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মুহাম্মদ মাজেদুল হক মাসুম, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ সালাউদ্দীন, মুহাম্মদ ইসমাঈল, হাজী মহররম আলী, আবদুস সালাম, আবুল কালাম আবু, মুহাম্মদ বখতেয়ার, মুহাম্মদ মিজান, মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ রুবেল-১, মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম, মুহাম্মদ রবিউল, মুহাম্মদ রুবেল-২।

পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড শাখার তৎপরতা নুবক্স হাজীর বাড়ী ইউনিট গঠন

গাউসিয়া কমিটি ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া নুরবক্স হাজী জামে মসজিদ ইউনিট কমিটি গঠনের লক্ষে এক সভা গত ১২ নভেম্বর মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন

মোহাম্মদ নাছির, বক্তব্য রাখেন হাজী মুহাম্মদ নুরুন্নবী মিয়া, মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম, আবদুল কাদের রুবেল, ওসমান গনি, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুহাম্মদ হারুন। আরো উপস্থিত ছিলেন নাজমুল হক বাচ্চু, ইয়াসিন বাদশাহ্, মুহাম্মদ নাছির মিস্ত্রি, মুহাম্মদ মনসুর প্রমুখ। উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ মানুর রশিদ (মামুন)কে সভাপতি ও মুহাম্মদ তারেক উদ্দিন (মুন্না) সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট গঠন করা হয়।

মিমতোয়া মসজিদ শাখা

গাউসিয়া কমিটি ১৭নম্বর ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল সম্প্রতি আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা সিদ্দীকীর সভাপতিত্বে, সেক্রেটারি মুহাম্মদ নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় মিম তোয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী, প্রধান বক্তা ছিলেন ছিলেন সাবেক কাউন্সিলর আরিফুল ইসলাম ডিউক, মুহাম্মদ ইউনুছ। এতে উপস্থিত ছিলেন রোকন উদ দৌলা, আবদুল হাকিম, মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ ইসমাইল প্রমুখ।

হযরত শাহ্ আমানত হাউজিং সোসাইটি শাখা

গাউসিয়া কমিটি ১৭নম্বর ওয়ার্ডস্থ হযরত শাহ্ আমানত হাউজিং সোসাইটি শাখার উদ্যোগে হাউজিং সোসাইটি জামে মসজিদে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়ার্ড ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী আমিনুল হক চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ ইউনুচ। আরো উপস্থিত ছিলেন মোকাম্মেল, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ আসহাব উদ্দিন, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম প্রমুখ।

আফগান মসজিদ ইউনিটের অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন আফগান মসজিদ ইউনিটের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী শীর্ষক আলোচনা ও অভিষেক অনুষ্ঠান গত ১৩ নভেম্বর বাদে মাগরিব সহ সভাপতি মুহাম্মদ আক্কাসের বাসভবনে ইউনিট সভাপতি মুহাম্মদ সরওয়ার আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান বাদশার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন মাওলানা নুরুল আমিন ছিদ্দিকী, প্রধান অতিথি ছিলেন বজলুর রহমান, প্রধান বক্তা ছিলেন ওয়ার্ড ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী আমিনুল হক চৌধুরী। অন্যন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিটের প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহাব উদ্দিন আহমদ। নব নির্বাচিত কমিটির সকলকে অঙ্গীকার নামা পাঠ করান ওয়র্ড ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জানে আলম জানু, বিশেষ অতিথি ছিলেন কামরুল হোসেন, মুহাম্মদ হোসাঈন, আবুল কালাম আবু, মুহাম্মদ ওসমানগণী, মুহাম্মদ হারুন, মুহাম্মদ ইউনুছ, নাছির উদ্দিন, মুজিবুর রহমান ও মুহাম্মদ রাসেল।

পাহাড়তলী ১২নং ওয়ার্ড শাখার দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১২নম্বর ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল সংগঠণের সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ মাসুদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউছুপ আলীর সঞ্চালনায় ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, পাহাড়তলী বাজার স্টেশন রোড ইউনিট শাখার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, মুহাম্মদ ইলিয়াস খোকন, মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, মুহাম্মদ নুরুল হক খোকন প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওলানা মুখতার আহমেদ আল-ক্বাদেরি।

কানাডায় বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ারের পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হিলভিউ শাখার সাবেক সদস্য, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল হামিদ মিরদাদ (আদনান) কানাডার ইউনিভার্সিটি অব এ্যালবার্টা হতে Structural Engineering of Mass timber panel concrete (mtpc) Composite System within Clined self Tapping Screws and an Insulation Layer শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে Post Doctoral Fellow হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। ইঞ্জিনিয়ার ড. আবদুল হামিদ মিরদাদ চট্টগ্রামের চুয়েট থেকে ২০১১ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে B.Sc. ডিগ্রী নিয়ে স্কলারশীপ সহকারে কানাডায় গমন করেন। পশ্চিম ষোলশহরস্থ হিলভিউ কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও মেয়র হজ্ব কাফেলার পরিচালক আলহাজ্ব এস.এম মূছা মিরদাদ'র একমাত্র সন্তান ড. মুহাম্মদ আবদুল হামিদ মিরদাদ (আদনান)'র গ্রামের বাড়ী চট্টগ্রামের রাউজানে।

বিশ্বনবী আল্লাহ্ তা'আলার সর্বোত্তম নি'মাত

...আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা শাখার উদ্যোগে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী ও মাসব্যাপী কর্ম সূচির সমাপনী মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন বলেন, "আল্লাহর এক মহানিয়ামত হুজুর রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর এ নেয়ামত অর্জনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পথে-মতে নিবেদিত রাখতেই গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি হুজুর গাউসে পাকের পবিত্র নামে গাউসিয়া কমিটির গোড়াপত্তন করেন।" তিনি আমাদের মা-বোনদের ঈমান-আকিদা রক্ষায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের ভূমিকা বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান সহ, পরিবার-পরিজন ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিপূর্ণ শালীনতা ও পর্দারমাধ্যমে বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব আনজাম দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল মহিলা কর্মকর্তাদের প্রতি মোবারকবাদ জানান।

প্রধান বক্তার ভাষণে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার দুনিয়া-আখেরাতের উন্নতির জন্যে গাউসিয়া কমিটির খেদমতকে অনন্য সোপান উল্লেখ করে এই কাজে মা-বোনদের খেদমতের প্রশংসা করে বলেন, বর্তমানে মহিলা কমিটি চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গ সহ পুরো দেশের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অচিরেই বিশ্বব্যাপী মহিলা বিভাগের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও বক্তাগণ মৃত মহিলার গোসল কাফনের প্রশিক্ষণ-এর ব্যাপারে মহিলা বিভাগ যে ভূমিকা পালন করে আসছে তার সফলতার ভুয়সী প্রশংসা করেন।

গত ১৭ই নভেম্বর নগরীর পশ্চিম ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা ফাযিল মাদরাসা অডিটোরিয়ামে চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা কমিটির সহ-সভাপতি শাহানা আফরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন-আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও করোনাকালীন রোগী সেবা ও মৃত কাফন-দাফন কর্ম সূচির প্রধান সমন্বয়ক এড.মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া মহিলা ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ড. মাওলানা মুহাম্মদ সারওয়ার উদ্দিন, গাউসিয়া কমিটি মহিলা বিভাগের উপদেষ্টাগণ ও কর্মকর্তাসহপ্রায় তিন শতাধিক মা-বোন।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা শাখা, চট্টগ্রাম মহানগরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জোবেদা খানমের সার্বিকতত্ত্বাবধানে, জান্নাতুল মাওয়া সাইমা ও সৈয়দা মাদিহা আল-বতুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অনলাইনে কিরাআত -হামদ-না'ত-স্বরচিত কবিতাসহ ৫ টি বিভাগে ৪০জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা বিভাগের পক্ষ থেকে "যাহরা বতুল ইসলামী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী" তাদের অনন্য পরিবেশনায় ফ্রান্সে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে অবমাননার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ সহকারে ফ্রান্সের সকল পণ্য বয়কটের আহবান জানায়।

পরিশেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এছাড়াও গত ৯ই রবিউল আউয়াল, ২৭ অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র মাহে রবিউন নূর উপলক্ষে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী মাহফিল অত্যন্ত সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। মাহফিলে রবিউল আউয়াল কর্ম সূচি উপলক্ষে নিজ নিজ এলাকায় পতাকা/ ব্যানার উত্তোলন করে ছবি তুলে পাঠানো; নিজ নিজ এলাকায় কর্মকর্তা দেরকে নিয়ে ঘরোয়া ভাবে মীলাদ মাহফিল এর আয়োজন করা যা অনলাইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মুয়াল্লিমাহ্ দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তাবারুকাতের আয়োজন করে এলাকাবাসীর মাঝে বিতরনের ব্যবস্থা; হোয়াটস এপ গ্রুপ এর মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম যথাসম্ভব চলমান রাখা সহ গন জমায়েত এর আয়োজন এড়িয়ে চলার সাংগঠনিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ইসলামী শরীয়তে মানুষ ও প্রাণীর ছবি অঙ্কন, প্রদর্শন ও ভাস্কর্য স্থাপন নিষিদ্ধ ও গুনাহ্

● চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলিমগণের অভিমত

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিশেষত; চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ওস্তাজুল ওলামা আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রধান ফকিহ্ আল্লামা মুফতি আবদুল ওয়াজেদ, জামেয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, চট্টগ্রাম সোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসার শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মুঈন উদ্দীন আশরাফী, অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভি, অধ্যক্ষ কারী মাওলানা নজরুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. আব্দুল হালিম এক যুক্ত বিবৃতিতে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে যে কোন প্রাণীর ও মানুষের ছবি অংকন ও প্রদর্শন (বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া) এবং মানুষ ও প্রাণীর ভাস্কর্য স্থাপন নিষিদ্ধ ও গুনাহ বলে মন্তব্য করেছেন। হাদিস শরীফে প্রাণীর ছবি অংকনকারী (প্রতিকৃতিকারী/ চিত্রকরদের উপর) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লানত (অভিসম্পাত) করেছেন।

(সহীহ্ বুখারী, হাদিস নং- ৫৯৬২)।

অপর হাদিসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার সামনে এরা (ছবি অংকনকারী, প্রদর্শনকারী, প্রতিকৃতি স্থাপনকারী) হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

(সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ৫২৮)।

তবে এ বিষয়ে দেশে অরাজকতা, বিশৃংখলা সৃষ্টি ও হুমকি ধমকি দেয়া, সংঘাত সৃষ্টি করা ইসলামের এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরামের আদর্শ নয়। তাঁরা আরো বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে (চাকুরী, পাস পোর্ট, ভিসা, বিদেশ গমন, হজ্ব, ওমরা ও প্রয়োজনীয় রেকর্ড ইত্যাদির) ক্ষেত্রে মানুষের ছবির ব্যবহার ও সংরক্ষণ হারাম ও গুনাহ্ পর্যায়ে অর্ন্তভূক্ত হবে না। এটাই ইসলামী শরীয়তের ফয়সালা।

উপরোক্ত সম্মানীত ওলামায়ে কেরাম বিবৃতিতে আরো বলেন, অন্যান্য ভাস্কর্যের বিষয়ে চুপ থেকে শুধু ব্যক্তি বিশেষের ভাস্কর্য নিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা সীমালঙ্ঘন ও ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টির নামান্তর, আর ফিতনা হত্যা হতে ও কঠিন অপরাধ, যা কোন হক্কানী আলেমের আদর্শ হতে পারে না তাঁরা বলেন, প্রয়োজনে মিশর, মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা মুফতিদের পক্ষ হতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মানুষ/ প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্যের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণে ফতোয়া তলব করে সমস্যা নিরসন করা উচিত। উপরোক্ত ওলামায়ে কেরামগণ দেশে সকল ধরণের সংঘাত ও অশান্তি সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী (রহ.)'র স্মরণ সভায় বক্তারা

দ্বীন-মাযহাবের খেদমতে কাজ করে গেছেন তিনি

হাজী ওয়াজের আলী আলকাদেরী (রহ.) স্মৃতি সংসদ আয়োজিত, আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ) এর খলিফা হাজী ওয়াজের আলী আলকাদেরী (রহ.) এর ৪২তম ওফাত বার্ষিকী ও মরহুমা ছাদিয়া বেগমসহ প্রয়াত মুরব্বিগণের ইছালে ছাওয়াব উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ফাইন্যান্স সেক্রেটারি আলহাজ্ব সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদত খানায় গত ৪ ডিসেম্বর বাদ মাগরীব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাদার্ন ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ও মুসাফির খানা জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ জালাল উদ্দীন আল আজহারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আনজুমানের এডিশনাল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামসুদ্দীন, মহানগর গাউসিয়া কমিটির সদস্যসচিব সাদেক হোসেন পাপ্পু, মাওলানা মোজাম্মেল হক হাসেমী, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মনোয়ার হোসেন মুন্না, আজহারুল হক আজাদ, সিদ্দিক আহমদ,

বাকলিয়া গাউসিয়া কমিটির কর্মকর্তা জামাল আহমদ খান, হাজী ইউনুস মেম্বার, আলহাজ্ব নুরুল আক্তার, আলহাজ্ব জামাল উদ্দিন সুরুজ, আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব সালাহউদ্দিন খাঁন রেজা, জানে আলম জানু, আবদুল করিম সেলিম, ওয়াজের আলী রোড ইউনিট গাউসিয়া কমিটির উপদেষ্টা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব এস এম ফারুক উদ্দীন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিম খোকন, আলহাজ্ব আজিম উদ্দীন, মোহাম্মদ আরিফ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ কাসেম, আলহাজ্ব আলাউদ্দিন বিটু, শেখ রফিউদ্দিন মিয়া, আলহাজ্ব মাহমুদুল হক, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলমগীর, আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাফর প্রমুখ। স্মৃতি সংসদ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের সঞ্চালনায় ওয়ার্ড-ইউনিট গাউসিয়া কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজী আব্দুন নুর, শেখ মোহাম্মদ জামাল, মোহাম্মদ ফরিদ কোম্পানি, স্মৃতি সংসদ সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ বশির, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ সোহেল, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ হামিদ, অর্থ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ নুর উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদমান আলী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আজোয়াদ আলী আবির প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দ্বীন-মাযহাবের খেদমতে সারাজীবন নিজেকে নিয়জিত রেখে সত্যিকার আশেকে রাসুল ও আশেকে ওলী বনে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ নিশ্চিত কারে গেছেন হাজী ওয়াজের আলী আলকাদেরী (রহ,)।

পরে মিলাদ ফাতেহাখানি ও দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্তি ঘটে।

শোক সংবাদ

গাউসিয়া কমিটি বাকলিয়া থানার সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আবু তাহের'র ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি বাকলিয়া থানার সাবেক সভাপতি পূর্ব বাকলিয়া কালামিয়া বাজার এলাকার মরহুম জাকের হোসেন সওদাগরের জৈষ্ঠ পুত্র, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সবাজসেবক মুহাম্মদ আবু তাহের সওদাগর গত ২৮ নভেম্বর ভোর ৫টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। ওই দিন বাদ যোহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি ছৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান'র ইমামতিতে কালামিয়া বাজার মোরআলী বাপের জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া হাফিজিয়া প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।

মরহুমের ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্‌টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, জামেয়া মাদ্‌রাসার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান পেয়ার মোহাম্মদ, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহাসচিব মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ তৈয়্যবুর রহমান, মুহাম্মদ কমরুদ্দিন সবুর, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সচিব মুহাম্মদ মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ১৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি সভাপতি আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জানে আলম জানু, ১৮ নং পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব ইউনুস মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সাব্বির আহম্মদ, ১৯ নং দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম সেলিম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আব্দুল হাই জিয়া

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ নিউইয়র্ক শাখার উপদেষ্টা ও চট্টগ্রাম সমিতি নর্থ আমেরিকার সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজসেবক আলহাজ্ব আব্দুল হাই জিয়া (৫৭) গত ৭ ডিসেম্বর, রাত ১১.২০ মিনিটে সময় এস্টোরিয়াস্থ মাউন্টসিনাই হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মরহুমের নামাজে জানাজা ৯ ডিসেম্বর বুধবার দুপুর ১টার সময় নিউইয়র্ক ব্রুকলীন চট্টগ্রাম ভবনের (৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ) সামনে অনুষ্ঠিত হয়। শেষে তাকে নিউজার্সির মার্লব্যুরো কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, দক্ষিণ জেলা

সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ মাস্টার, গাউসিয়া কমিটি নিউইয়র্ক শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান, ইউ.এস.এ পেনসিলভেনিয়ার সভাপতি মুহাম্মদ মুছা, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমীর হোসেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত ইউ.এস.এ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ জুবায়ের আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ মোরশেদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ডা: আনজুমান আরা ইসলাম, ট্রেজারার মুহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুহাম্মদ নুরুল আলম

গাউসিয়া কমিটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড শাখার আওতাধীন মদিনা মসজিদ শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল আলম গত ৫ নভেম্বর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। দেওয়ান বাজার সিএন্ডবি কলোনী জামে মসজিদে জানাযা জানাযা শেষে হযরত মিসকিন শাহ্ (রহ.)'র মাজার কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ১৬নং কচুয়াই ইউনিয়ন সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম গত ১২ নভেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। প্রবীণ এ খাদেমের মৃত্যুতে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ২ মেয়ে, স্ত্রী সহ অনেক গুনগ্রাহী রেখে যান। তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে আন্তরিকতা ও ইখলাসের সহিত গাউসিয়া কমিটি, আণজুমান ও জামেয়ার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

আবদুস শুক্কুরের স্মরণ সভা ও মিলাদ মাহফিল

রাউজান উপজেলা (দক্ষিণ) শাখা গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে চট্টগ্রাম উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির সাবেক সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ আব্দুস শুক্কুর ও দক্ষিণ রাউজান নোয়াপাড়া তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার ভুমিদাতা আলহাজ গাজী শামসুল আলমের স্মরণ সভা ও মিলাদ মাহফিল গত ২১ নভেম্বর নোয়াপাড়াস্থ শাহ আমানত কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই খেদমতগারের জীবন কর্মের উপর আলোচনায় বক্তারা বলেন, তাঁরা গোটা জীবন গাউসিয়া কমিটি ও সিলসিলার খেদমত আঞ্জামে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। রাউজান উপজেলা (দক্ষিণ) শাখা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ আবু বক্কর সওদাগরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হানিফের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, নোয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বাবুল মিয়া, জেলা গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন হায়দারী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, নোয়াপাড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, জমির হুসাইন মাস্টার, প্রকৌশলী মুহাম্মদ নুরুল আজিম, মুহাম্মদ আবু ইউসুফ চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল খালেক, মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন। প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, সৈয়দ মুহাম্মদ হোসাইন, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু মোস্তাক আলকাদেরী, মরহুম আব্দুস শুক্কুরের ছেলে মাওলানা আব্দুর রহিম, মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সাবেক সভাপতি লায়ন আহমেদ সৈয়দ, অধ্যক্ষ ওমর ফারুক মাস্টার, আজম আলী, মুহাম্মদ হাবিবুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মেম্বার, মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, এম বেলাল উদ্দিন, মুহাম্মদ আজিজুল হক, মাওলানা সৈয়দ শওকত হুসাইন রেজভী, মাওলানা অলিউর রহমান, মাওলানা আশেকুর রহমান, মাওলানা আব্দুল করিম, মুহাম্মদ জাহেদুল হক, শফিউল আজম কোম্পানি, আলহাজ্ব আইয়ুব মাস্টার,

অধ্যাপক সিরাজুল আরেফীন চৌধুরী, মুহাম্মদ তসলিম উদ্দিন, মফিজুল আলম শাহ্, মুহাম্মদ ফিরোজুল ইসলাম, মুহাম্মদ নওশাদ হুসাইন, আবদুর রহমান সাহেদ, নুরুল হাকিম নিয়াজ, সৈয়দ মুহাম্মদ ফজল আকবর, মুহাম্মদ ইউনুস আলম, সৈয়দ আবদুর রহমান সোহেল, আবদুল আল মামুন, মুহাম্মদ আলি প্রমুখ। মিলাদ কিয়াম শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন মরহুম আব্দুস শুক্কুরের ছেলে মাওলানা আব্দুর রহিম।

গশ্চি জামে মসজিদ ইউনিট শাখা

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুস শুক্কুর (রহ.) এর স্মরণ সভা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ গশ্চি জামে মসজিদ ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ্ব আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন আলকাদেরী,গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা দক্ষিণের সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, সহ সভাপতি মুহাম্মদ হাবিবুল ইসলাম চৌধুরী,প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হানিফ, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ তাজিন মাবুদ ইমনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি মাওলানা অলিউর রহমান আলকাদেরী, বক্তব্য রাখেন উপজেলা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, বাগোয়ান ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আইয়ুব মাস্টার, মুহাম্মদ সিরাজুল আরেফিন চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল রোমান, সহ সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুর রহমান সোহেল, মুহাম্মদ ইসমাইল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আবু জাহেদ, মুহাম্মদ মিজানুল করিম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মাস্টার, সমাজ সেবা সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, আলহাজ্ব আবদুস শুক্কুর (রহ.)'র সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, মুহাম্মদ আবদুল হামিদ।

-ঘোষণা-

মানবজাতির কমবেশী অর্ধেক নারী। তাদের বিভিন্ন অবস্থা, চাহিদা ও সমস্যার যথাক্রমে বিবেচনা, পূরণ এবং সমাধানের ব্যাপারেও ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষে মাসিক তরজুমান আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে **'মহিলা বিভাগ'** চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মহিলা বিষয়ক গবেষণাধর্মী ও দিক-নির্দেশনা সম্বলিত লেখা দ্বারা এ বিভাগকে সমৃদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য। তাই নিয়মিতভাবে এ বিভাগও পড়ুন এবং লিখুন। **...সম্পাদক**

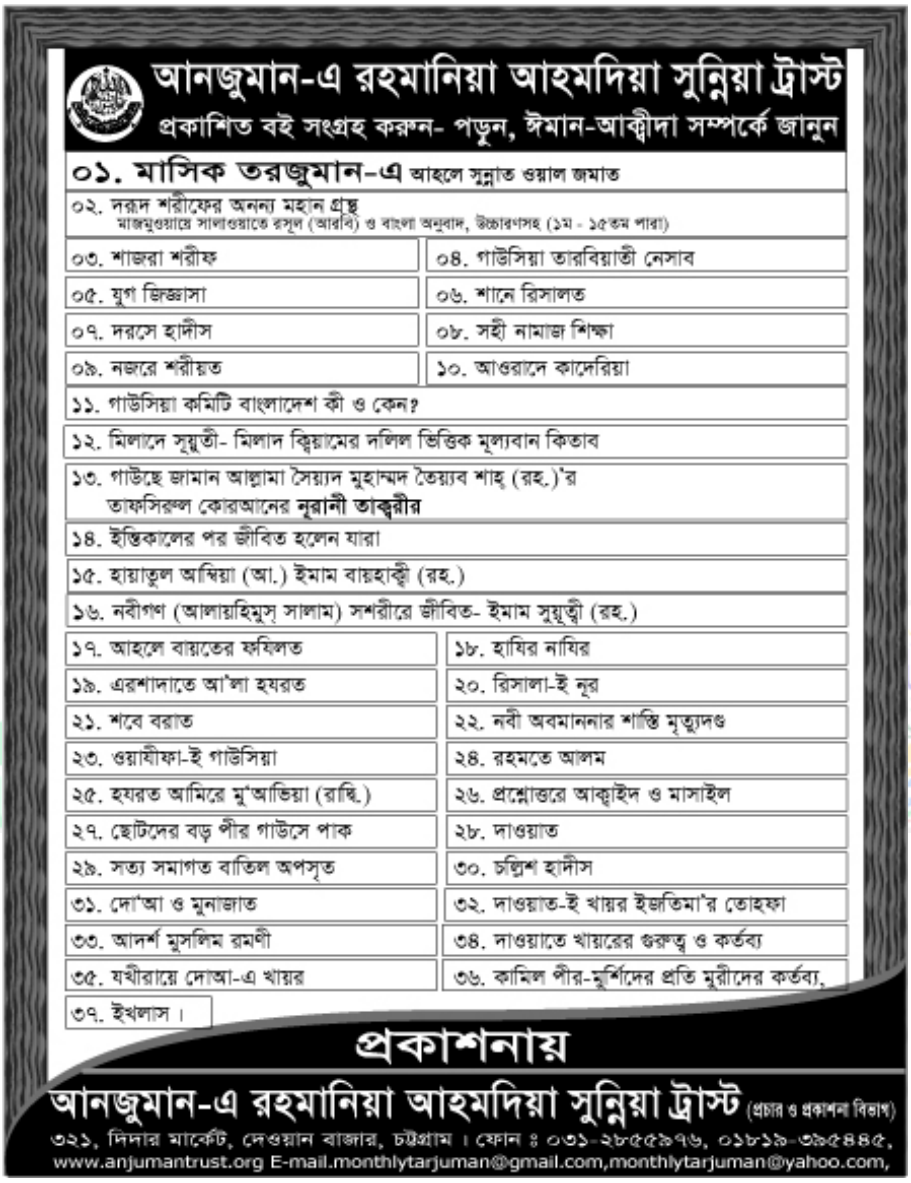
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
প্রকাশিত বই সংগ্রহ করুন- পড়ুন, ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে জানুন
০১. মাসিক তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
০২. দরূদ শরীফের অনন্য মহান গ্রন্থ
মাজমুওয়াতে সালাওয়াতে রসূল (আরবি) ও বাংলা অনুবাদ, উচ্চারণসহ (১ম - ১৫তম পাবা)
০৩. শাজরা শরীফ
০৪. গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব
০৫. যুগ জিজ্ঞাসা
০৬. শানে রিসালত
০৭. দরসে হাদীস
০৮. সহী নামাজ শিক্ষা
০৯. নজরে শরীয়ত
১০. আওরাদে কাদেরিয়া
১১. গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কী ও কেন?
১২. মিলাদে সুয়ূতী- মিলাদ ক্বিয়ামের দলিল ভিত্তিক মূল্যবান কিতাব
১৩. গাউছে জামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র
তাফসিরুল কোরআনের নূরানী তাক্বরীর
১৪. ইন্তিকালের পর জীবিত হলেন যারা
১৫. হায়াতুল আম্বিয়া (আ.) ইমাম বায়হাক্বী (রহ.)
১৬. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) সশরীরে জীবিত- ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.)
১৭. আহলে বায়তের ফযিলত
১৮. হাযির নাযির
১৯. এরশাদাতে আ'লা হযরত
২০. রিসালা-ই নূর
২১. শবে বরাত
২২. নবী অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড
২৩. ওয়াযীফা-ই গাউসিয়া
২৪. রহমতে আলম
২৫. হযরত আমিরে মু'আভিয়া (রাদ্বি.)
২৬. প্রশ্নোত্তরে আক্বাইদ ও মাসাইল
২৭. ছোটদের বড় পীর গাউসে পাক
২৮. দাওয়াত
২৯. সত্য সমাগত বাতিল অপসৃত
৩০. চল্লিশ হাদীস
৩১. দো'আ ও মুনাজাত
৩২. দাওয়াত-ই খায়র ইজতিমা'র তোহফা
৩৩. আদর্শ মুসলিম রমণী
৩৪. দাওয়াতে খায়রের গুরুত্ব ও কর্তব্য
৩৫. যখীরায়ে দোআ-এ খায়র
৩৬. কামিল পীর-মুর্শিদের প্রতি মুরীদের কর্তব্য,
৩৭. ইখলাস।
প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট (প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ)
৩২১, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫,
www.anjumantrust.org E-mail.monthlytarjuman@gmail.com,monthlytarjuman@yahoo.com,